বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭)

বাঙালী রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭)

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

BANGALI RAJNITIR PANCHAS BACHHAR AMAL KUMAR MUKHOPADHYAY

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা ১৯৯৯

প্রকাশক

রাজীব নিয়োগী

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ:

ফোটোটাইপ সেটিং

কসমিক কম্পিউটার একাডেমি

হাওড়া ৭১১১০৬

মুদ্রক :

আর. কে. প্রোসেস

৬৫, ডঃ কে. এস. রায় রোড

যাদবপুর

কলকাতা-৭০০০৩২

মূল্য : ষাট টাকা

ডঃ সত্যব্রত দত্ত

শ্রীমতী মীনা দত্তগুপ্তা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। এ বই লেখা হয়েছে এই কথা মনে রেখেই। তবে একে ইতিহাস না বলে আখ্যান বলাই ভাল। কারণ ইতিহাস রচয়িতার দায় অনেক বড় এবং, বলা বাহুল্য, সে দায় পালনের যোগ্যতা আমার নেই। আমার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে আমি পঞ্চাশ বছরের বাঙালি রাজনীতির একটি সুখপাঠ্য ও নিরপেক্ষ ধারাবিবরণী দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। স্বভাবতই এ বই সাধারণ মানুষের জন্য, পণ্ডিত গবেষকদের জন্য নয়। অবশ্য আমার এ বই পড়ে কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পঞ্চাশ বছরের বিস্তারিত ও প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত হন তাহলে নিঃসন্দেহে কৃতার্থ বোধ করব। তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু বইপত্র ও রিপোর্টের সাহায্য নিলেও মূলত নির্ভর করেছি স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার ও বর্তমান পত্রিকার ওপর। তবে বিভিন্ন স্তরে আলাপ আলোচনা করে এইভাবে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। এতৎসত্ত্বেও যদি কোনও তথ্যগত ভুল থাকে তাহলে তা আমার নজরে আনলে কৃতজ্ঞ থাকব। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সবিশেষ সাহায্য করেছেন সাংবাদিক শ্রী নিশীথ দে এবং সমাজসেবী শ্রী প্রশান্ত সান্যাল। বই পত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক হিমাচল চক্রবর্তি, অধ্যাপক অশোক সরকার, অধ্যাপক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা মন্দার মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান পত্রিকার কর্ণধার ও সম্পাদক শ্রীবরুণ সেনগুপ্তের অনুমতিক্রমে এই বইয়ের সব অধ্যায়ই প্রাথমিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক মাস ধরে ষোলটি কিস্তিতে, বর্তমান-এ আমার খোলা চোখে, খোলা মনে' শীর্ষক সাপ্তাহিক কলামে। শ্রী সেনগুপ্তকে ও আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা — অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১০ জানুয়ারি, ১৯৯৯

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রবেশ ও প্রস্থান

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন বাঙালি ক্লান্ত, কাতর ও বিপর্যস্ত নানা কারণে এবং তার সামনে সংশয় আর অনিশ্চয়তার ঘোর অন্ধকার ঘনায়মান। স্বাধীনতা-পূর্বকালে কিঞ্চিৎ ভীরু ও অতীব শান্তিপ্রিয় বাঙালির সমাজজীবনে প্রথম ঝড় নিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসাবে অখণ্ড বঙ্গভূমিকে এই ঝড়ের অনেকটাই বুক পেতে নিতে হয়। পরিণামে বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত ধারণা ও বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি সমাজে জন্ম দেয় এক নতুন শ্রেণীর। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কন্ট্রাকটর, দালাল, ফড়িয়া ও ধান্দাবাজ যারা চোরা পথ দিয়ে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে সহজে টাকা রোজগারের কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। এদের সক্রিয়তায় বঙ্গ প্রদেশের আর্থব্যবস্থায় যে নতুন পরিমণ্ডল তৈরি হয় বাঙালি তার নাম দেয় কালো বাজার। এই কালো বাজার একদিকে যেমন বাঙালির ঘরের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে অন্যদিকে তেমনই এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে সাধারণ বাঙালি তার নীতিবোধ হারাতে থাকে, অর্থাৎ সে-ও এখন চোরাপথে নিজের স্বার্থসিদ্ধির ফিকির খুঁজতে থাকে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই বাঙালি জীবনে দেখা দেয় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। মানুষের তৈরি করা এই দুর্ভিক্ষের পরিণামে বঙ্গপ্রদেশে তিরিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয় এবং আরও বহু লক্ষ মানুষের জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ বাঙালি ক্ষুধার জ্বালায় আর বেঁচে থাকার তাগিদে হারায় তার সম্ভ্রম আর ন্যায়-অন্যায় বোধ। অর্থাৎ, বাঙালি মূল্যবোধে প্রবল আঘাত হানে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। এই আঘাত কাটিয়ে ওঠার সময় ও সুযোগ পাওয়ার আগেই বাঙালি মুখোমুখি হয় কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। নিরর্থক এই গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়াকে অস্বীকার করে দেখা দেয় এক অন্ধ বৈরিতা। এর ফলে আহত হয় বাঙালির শুভবুদ্ধি আর মূল্যবোধ।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা যখন আসে, তখন বঙ্গবিভাগ থেকে উদ্ভূত বাঙালি সমাজ যথেষ্ট বিধ্বস্ত এবং এই রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের মন সন্দেহ ও আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে বাঙালি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ধুয়ে-মুছে ফেলে রাস্তায় রাস্তায় আনন্দমিছিলে যোগ দিয়েছিল বটে, কিন্তু বিগত সাত বছরের ঘটনাবলীর প্রভাবে তার সমাজজীবনে যে কলুষ ও ক্লেদ জমা হয়েছিল তা থেকে মুক্তিলাভের পথ তার জানা ছিল না। স্বভাবতই স্বাধীনতাকে বাঙালি বরণ করেছিল সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তার আশঙ্কা কম ছিল না। আবার যে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালি একদিন ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিল এবং জয়ীও হয়েছিল, ভাগ্যের পরিহাসে সেই বঙ্গবিভাগকে মেনে নিতে হওয়ায় বাঙালি মনে কোনও স্বস্তি ছিল না। সর্বোপরি খণ্ডিত বাঙলা পশ্চিমবঙ্গ রূপে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে স্থিতিক্ষম হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়েও তার সবিশেষ উদ্বেগ ছিল।

এই সংশয়, আশঙ্কা আর উদ্বেগের মধ্যে বাঙালিকে আর এক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় স্বাধীনতা পাওয়ার অল্প দিনের মধ্যে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্বস্ব হারিয়ে অথবা পিছনে ফেলে রেখে আসতে বাধ্য

হয়ে আশ্রয়ের আশায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকেন এবং বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে শরণার্থীদের এই আগমন স্রোত অব্যাহত থাকে। ছিন্নমূল এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আগমন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ছিল এক চরমতম সঙ্কট। একদিকে ছিল লক্ষ লক্ষ শরনার্থীর পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডে নতুন করে জীবন শুরু করার তথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমস্যা। অন্য দিকে ছিল এই সদ্য আগত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মূল জনগোষ্ঠীর অটুট সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা। দুটি সমস্যাই ছিল কঠিন। কারণ ভারতবর্ষের মতো এক অনুন্নত দেশের ছোট একটি রাজ্যের পক্ষে হঠাৎ আগত বিপুলসংখ্যক সহায় সম্বলহীন মানুষের নতুন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না যেহেতু এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্ন। আবার নিজেদের সুযোগ-সুবিধার ভাগ দিতে হবে এই আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গে র মূল বাসিন্দারা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের কাছে টেনে নেবেন না এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল।

সুখের কথা এই যে স্বাধীনতার পনেরো বছরের মধ্যেই এই দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই কালপর্বের মধ্যে আগত শরণার্থীরা যেমন সুষ্ঠুভাবেই প্রতিষ্ঠিত হন তেমনই পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁরা চমৎকারভাবে মিশে যান। স্বাধীনতা উত্তরকালে এ ছিল বাঙালির এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এই সাফল্য আসে কয়েকটি কারণে। প্রথমত্ব পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন তাঁরা অসামান্য সাহস, ধৈর্য ও উদ্যমের পরিচয় দেন। বস্তুত, দুঃসাহসী যোদ্ধার মানসিকতা নিয়ে তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং পরিণামে সাফল্য তাঁদের করায়ত্ত হয়। দ্বিতীয়ত বামপন্থী দলগুলি, বিশেষত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি, আগত শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এরই পাশাপাশি ছিল পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের উদার মানসিকতা। বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের কেউ কেউ শরণার্থী আগমন সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও সাধারণভাবে তাঁরা এঁদের ভালবেসেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু শরণার্থীরা দলে দলে চলে আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারত। গোড়ার দিকে, বস্তুত, এই সম্প্রীতিতে কিছু ফাটল দেখা দেয়। যেমন ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলায় হিন্দুদের ব্যাপকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলকাতা নগরীতে বিক্ষিপ্তভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় যদিচ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় নিজে লালবাজার পুলিস কন্ট্রোলরুমে উপস্থিত থেকে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরবর্তী পর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে স্বাধীনতা-উত্তর কালের পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অটুটই থাকে যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়কে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হয় নি। এ-ও ছিল বাঙালির এক বড় সাফল্য। এর পিছনে অবশ্য রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টির র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা ও কর্মসূচি স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রথম দুই দশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এক সজাগ প্রহরীর কাজ করে।

তবে স্বাধীন ভারতবর্ষে যে সংশয় ও উদ্বেগ নিয়ে বাঙালি জীবন শুরু হয়েছিল তা দূর করার ব্যাপারে সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল যাঁর তাঁর নাম ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্র চোদ্দ বছর ছ'মাস ধরে একটানা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। এই কালপর্বে ভাগ্যতাড়িত বাঙালিকে তিনি নতুন জীবন দান করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতার প্রথম পনেরো

বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের এক অগ্রণী রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিধানচন্দ্রের এই নেতৃত্ব অবশ্য স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় নি। তিনি পুরোভাগে এসেছিলেন কয়েক মাস পরে এবং কতকটা আকস্মিকভাবে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। কিরণশঙ্কর ছিলেন ধীর-স্থির প্রকৃতির ব্যক্তি এবং পণ্ডিত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সুরসিক। ব্যারিষ্টারি পাশ করেও তিনি কখনও কোর্টে সওয়াল করেন নি এবং প্রমথ চৌধুরির বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র 'সবুজপত্র'-এর লেখকও ছিলেন তিনি। অর্থাৎ, নেতা হওয়ার সবরকম যোগ্যতাই তাঁর ছিল এবং তাঁর সমকালীন বাঙালি সমাজেও তিনি ছিলেন এক বিশেষ আদৃত ব্যক্তি। তথাপি খণ্ডিত বাঙলার শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দানের প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন তিনি উপেক্ষিত হন। কিরণশঙ্কর রায় যদি সেদিন পশ্চিমবঙ্গের কাণ্ডারী হতেন তাহলে সম্ভবত বাঙালি রাজনীতির হাল ধরার জন্য বিধানচন্দ্রের আর ডাক পড়ত না। কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশ ছিল অন্যরকম। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত মুহূর্তে যোগ্য আসন লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। অবশ্য এর পিছনে একটি বিশেষ কারণও ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও বঙ্গপ্রদেশের গভর্নর বারোজের পরোক্ষ মদতে এবং মূলত শরৎচন্দ্র বসু ও প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাশিমের উদ্যোগে স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ডিত বাঙলা গঠনের যে প্রস্তাব প্রণীত হয় কিরণশঙ্কর তা শুধু সমর্থনই করেন নি, কংগ্রেস শিবিরে এই প্রস্তাব গ্রহণের সপক্ষে তিনি যথেষ্ট ওকালতিও করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী এবং প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় সকলেই সংযুক্ত, স্বাধীন বাঙলার প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। সর্বোপরি সেদিনের শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বৈরিতায় এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে সাধারণভাবে জনমত ছিল স্বাধীন, সংযুক্ত বাঙলার বিরুদ্ধে। অনিবার্যভাবেই তাই সেদিন অখণ্ড, স্বাধীন বাঙলার সমর্থক কিরণশঙ্করের ওপর আস্থা হারিয়েছিল বঙ্গপ্রদেশের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মহল। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ২২ জুন অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন জেলাগুলির কংগ্রেস বিধায়করা তাঁদের নেতা নির্বাচনের জন্য যখন এক সভায় মিলিত হন তখন কিরণশঙ্কর রায়কে বিস্মৃত হয়ে তাঁরা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন এবং সুরেন্দ্রমোহন শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম · প্রত্যাহার করে নেওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেতা নির্বাচিত হন যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে দুমাস পরে পশ্চিমবঙ্গ নামে যে রাজ্যটি আত্মপ্রকাশ করবে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষই হবেন তার প্রধানমন্ত্রী (ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী রূপেই অভিহিত হতেন)। পরের দিন, অর্থাৎ ২৩ জুন মুসলিমরা যে সব জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সব জেলার কংগ্রেস বিধায়করা কিরণশঙ্কর রায়কে তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। এতে কিরণশঙ্করের মুখরক্ষা হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের কাণ্ডারী হওয়ার সুযোগই শুধু কিরণশঙ্কর রায়ের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় নি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগও কার্যত নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার শাসনব্যবস্থা সচল থাকে সেজন্য গভর্নর বারোজ স্বাধীনতার আগেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং কংগ্রেসি বিধায়কদের ২২ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে এই মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। তনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই আটজন সহযোগী মন্ত্রীসহ প্রফুল্ল ঘোষ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বারোজের কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ নেন এবং ১৯৪৭ সালের

১৫ আগস্ট থেকে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীন এই মন্ত্রিসভাই পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হয়ে আসেন চক্রবর্তি রাজাগোপালাচারী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে পশ্চিমবঙ্গবাসী সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। কারণ একজন সৎ, আদর্শনিষ্ঠ গান্ধীবাদী নেতা হিসাবে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাঁর আত্মত্যাগের কথাও জনসাধারণ জানত। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র এবং নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষাপর্ব শেষ করে বড় সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং গান্ধীর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। কাজেই আশ্চর্য নয় যে দশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠিত কুমিল্লার অভয় আশ্রম এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠান-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল যে কারণে প্রদেশ কংগ্রেসে খাদি গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি বড় মাপের সংগঠক অথবা উঁচুমানের নেতৃত্ব দানে দক্ষ ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ স্বাধীনতা-পূর্বকালে বঙ্গবাসী পায় নি। তা ছাড়া অনমনীয়তা ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা রাজনীতি ও প্রশাসনে অনেক সময়েই অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করে।

হয়ত এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করে প্রফুল্লচন্দ্র অসামান্য প্রশাসনিক দক্ষতা ও তৎপরতার কোনও পরিচয় রাখতে পারেন নি। অবশ্য প্রশাসনকে চাঙ্গা করার জন্য তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বিচার বিভাগের কয়েকজন উচ্চ পদাধিকারীকে তিনি প্রশাসনে নিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকুমার সেন, করুণাকান্তি হাজরা, শৈবাল গুপ্ত ও রনজিৎ গুপ্ত। এঁদের মধ্যে সুকুমার সেনকে করা হয় মুখ্যসচিব এবং অন্যান্যেরা হন বিভিন্ন বিভাগের সচিব। এঁরা সকলেই দক্ষ প্রশাসক হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের এক সবল ভিত তৈরি করে দেন। কালোবাজারি দমন ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বঙ্গপ্রদেশে ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এবং মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র এই ভেজাল দমনকে প্রশাসনিক কাজকর্মের অগ্রাধিকার তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান দেন এবং তাঁর নির্দেশে পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ যত্রতত্র ব্যবসায়ীদের গুদামে হানা দিয়ে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য আটক করতে থাকে। এতে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ী মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তাঁর নিজের দলের অনেকেই পুলিশ বিভাগের এই অতি-সক্রিয়তা অপছন্দ করতে থাকেন। আদর্শনিষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিজের ওপর আস্থার অভাব লক্ষ করে পদত্যাগ করেন ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।

তৎকালীন বাঙালিসমাজে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের এই পদত্যাগকে অসাধুতার কাছে সৎ প্রফুল্লচন্দ্রের পরাজয় বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি মনে করেছিলেন যে ভেজাল দমনে প্রফুল্লচন্দ্রের তৎপরতায় বিরক্ত হয়ে ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগকে খুশি মনে স্বাগত জানিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে শুধু ব্যবসায়ীদের চাপে পড়েই ডঃ ঘোষকে বিদায় নিতে হয়েছিল এই ধারণাও ছিল আংশিকভাবে সত্য। প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্লচন্দ্রের পদত্যাগের কারণ ছিল আরও গভীরে এবং এ জন্য তাঁর চরিত্রের অনমনীয়তা ও আপসহীনতাও কম দায়ী ছিল না।

তাঁর এই অনমনীয়তা ও আপসহীনতা সঙ্কটের সূত্রপাত করেছিল স্বাধীনতার আগেই এবং পদত্যাগ ছিল তারই চূড়ান্ত পরিণাম। ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে তার অন্যতম সদস্য ছিলেন রাধানাথ দাস। মন্ত্রিসভা গঠনের এক মাসের মধ্যেই ডঃ ঘোষ রাধানাথ দাসকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন এবং প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানান। অন্যদিকে অনমনীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেসে প্রবল গোলযোগ দেখা দেয়। পরিস্থিতি এতই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে মীমাংসার জন্য স্বাধীনতার ঠিক আগে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনিকে কলকাতায় ছুটে আসতে হয়। অনেক আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বিষয়ে ডঃ ঘোষের আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ১৫ আগস্টের পরেও অপরিবর্তিতই থাকে। প্রধানমন্ত্রীর এই অনমনীয়তার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই তাঁর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং ফলত স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র চার মাস সরকারের নেতৃপদে থাকার পর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রফুল্লচন্দ্রের এই পদত্যাগ অবশ্য অনিবার্যই ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান দুটি গোষ্ঠী পরিচিত ছিল'খাদি গ্রুপ' ও 'হুগলি গ্রুপ' নামে । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন খাদি গ্রুপের প্রতিনিধি আর হুগলি গ্রুপের সক্রিয় প্রবক্তা হিসাবে সে সময় বিশেষ পরিচিতি ছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুলা ঘোষ, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের। গান্ধীর অনুগামিতায় খাদি গ্রুপ ছিল হুগলি গ্রুপের তুলনায় অনেক এগিয়ে এবং এই প্রেক্ষাপটে সর্বভারতীয় স্তরে স্বভাবতই তার গুরুত্ব ছিল সমধিক। অন্য দিকে রাজ্য স্তরে গুরুত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির বিচারে প্রদেশ কংগ্রেসে প্রকৃত প্রাধান্য ছিল হুগলি গ্রুপেরই। বলা বাহুল্য, হুগলি গ্রুপ প্রফুল্লচন্দ্রের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে নি। তথাপি ১৯৪৭-এর ২২ জুন প্রফুল্ল ঘোষ যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেতা নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন তার কারণ কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল তাঁর পিছনে। তা ছাড়া হুগলি গ্রুপের প্রবক্তারা সে সময় নেতা হওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পান নি। কিরণশঙ্কর রায়ের কথা তাঁরা আদৌ ভাবতে পারেন নি কী কারণে তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁরা অবশ্য সেই সময়েই বিধানচন্দ্র রায়ের কথা বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে তখন পাওয়া যায়নি, তিনি তখন ছিলেন বিদেশে। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এসে বিধানচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভায় নির্বাচিত হন। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরেও হুগলি গ্রুপের প্রবক্তারা হাল ছাড়েন নি, তাঁরা প্রফুল্ল ঘোষকে সরাতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে রাধানাথ দাসকে কেন্দ্র করে যে গণ্ডগোল দেখা দেয় তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে হুগলি গ্রুপ যার পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ ডঃ রায়কে এই আশ্বাস দেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলে বিধানসভার অধিকাংশ সদস্য তাঁকে সমর্থন করবেন। ডঃ রায় কিন্তু তৎক্ষনাৎ তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর হুগলি গ্রুপের প্রবক্তারা বিধানচন্দ্রের ওপর প্রবল চাপ দিতে থাকেন যদিচ তখনও বিধানচন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে রাজি হন নি। অবশেষে হুগলি গ্রুপের প্রবক্তারা নিরুপায় হয়ে সম্ভবত গান্ধীর শরণাপন্ন হন এবং গান্ধী নিজে বিধানচন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানালে ডঃ রায় তাঁর সম্মতি দেন।

এইভাবে বাঙালি জীবনে এক নতুন যুগের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি যেদিন ডঃ রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভাআনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস দলে ছিলেন তিন বছর যদিচ দলের সিদ্ধান্তকরণ প্রক্রিয়ায় তাঁর আর কোনও বড় ভূমিকা ছিল না। এই পর্বে দলের ক্ষমতাশালী নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর দূরত্বই শুধু বাড়তে থাকে। অবশেষে ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ১৯৫২-এর নির্বাচনে এই দল কিছু ভাল ফল করলেও কালক্রমে পঞ্চাশের দশকেই এই দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং প্রফুল্লচন্দ্র রাজনৈতিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রায় এক দশক পরে তিনি আবার ফিরে আসেন পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির মূল মঞ্চে। কিন্তু সে ইতিহাস পরে।

স্বর্ণযুগের অগ্রদূত বিধানচন্দ্র রায়

চিকিৎসাজগতের কিংবদন্তি বিধানচন্দ্র রায় রাজনীতিতে অবশ্যই ভুঁইফোড় ছিলেন না। স্বাধীনতা-পূর্বকালের বঙ্গপ্রদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এক বর্ষীয়ান ও স্বনামধন্য রাজনীতিককে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে তিনি বাঙালি সমাজে আলোড়ন তোলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনাবসানের পর বাঙালি রাজনীতিতে যাঁরা' বিগ ফাইভ' বলে পরিচিত হন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তথাপি স্বাধীনতা-উত্তর কালের পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার তিনি সত্যিই হতে চাননি। বস্তুত, স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি যে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তার প্রকৃত কারণ সম্ভবত ছিল এই যে নেতৃত্ব নিয়ে তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস রাজনীতির টানা-পোড়েন থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। দেশে ফিরেও তিনি আগাগোড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি সম্ভবত এই কারণে যে তাঁকে এই অনুরোধ করা হয়েছিল এমন সময়ে যখন গান্ধী অনশনরত। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে সারা দেশেই আজ রাজনীতি ও ক্ষমতালিপ্সা এমনই মিলে-মিশে গেছে যে শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ আসন গ্রহণে এই অনীহা এখন কল্পনাই করা যায় না। লক্ষণীয় যে যদিও হুগলি গ্রুপ এবং তৎ সহ কিরণশঙ্কর রায়ের উৎসাহে ও সমর্থনে বিধানচন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হয়েছিল তথাপি একেবারে গোড়াতেই তিনি স্পষ্ট করে দেন যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে তিনি রাজি নন। তাই শপথ গ্রহণের আগে মন্ত্রিসভা গঠন স্থির করতে গিয়ে তিনি সমর্থকদের পরামর্শ অনুযায়ী না চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। একইভাবে কংগ্রেস সরকারের প্রধান হয়েও কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের কাছে তিনি যে আত্মসমর্পণ করবেন না সে কথাটাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে বিধানচন্দ্র বিদেশে থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও মন্ত্রী সম্পর্কে নানা অভিযোগ থাকায় এ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণার আগে নেহরু এ বিষয়ে বিধানচন্দ্রকে বিন্দুবিসর্গও জানান নি বলে বিধানচন্দ্র সাতিশয় অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ এক স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্যে মূল যুক্তি ছিল দুটি। প্রথমত, তাঁর যুক্তি ছিল এই যে রাজ্যের কোনও মন্ত্রী সম্পর্কিত কোনও অভিযোগ থাকলে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের অবর্তমানে এবং তাঁকে আদৌ কিছু না জানিয়ে এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা নিয়ম ও প্রথা বহির্ভূত। দ্বিতীয়ত, তাঁর মত ছিল এই যে তদন্তের প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই,ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন। তাঁর এই ঋজু প্রতিবাদের পরিণামে তদন্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে যতদিন বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তত দিন দিল্লি কখনই আর পশিচমবঙ্গের প্রশাসনের ওপর খবরদারি করার চেষ্টা করে নি। আবার ১৯৫৮ সালে বিধান রায়ের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মন্ত্রিপদ থেকে পদত্যাগ করে বিধানসভায় যে দীর্ঘ বিবৃতি দেন তাতে তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই বিবৃতির বয়ান সম্পর্কে অবহিত হয়ে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু প্রফুল্ল সেনকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কার্যত নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু প্রফুল্ল সেন সম্পর্কে সবিশেষ আস্থাশীল বিধান রায় এ ব্যাপারে কোনও চাপের কাছে

নতি স্বীকার না করে প্রফুল্ল সেনকে তাঁর নিজ পদে বহাল রাখেন। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানচন্দ্র কতটা কর্তৃত্ব সচেতন ও স্বাতন্ত্র্যকামী ছিলেন।

১৯৫০ সালে অতুল্য ঘোষ সর্বসম্মতিক্রমে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সুসংগঠক অতুল্য ঘোষ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের কাছে পরিস্থিতি অনেকটা সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। কারণ এখন থেকে দলীয় সংগঠনের সমস্ত দায়িত্বই তিনি অতুল্য ঘোষের হাতে ছেড়ে দেন এবং সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন প্রশাসনে। এ ছাড়া এখন থেকে একটা অলিখিত নিয়মও গড়ে ওঠে যে দল ও প্রশাসন পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। যতদিন বিধানচন্দ্র জীবিত ছিলেন ততদিন এই নিয়ম তিনি ও অতুল্য ঘোষ দুজনেই যথাযথভাবে মেনে ছিলেন। এর ফলে অতুল্য ঘোষ যেমন স্বাধীন ভাবে দলকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তেমনই বিধানচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে উৎসর্গ করেন নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার কাজে। এই গড়ার কাজটি ছিল এমনই গভীর চিন্তা ও বাস্তববুদ্ধি প্রসূত এবং সুসংগঠিত ও সুসম্বদ্ধ এক দীর্ঘ চলমান প্রক্রিয়া যে সালতারিখ সহ তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে হবে। এই কারণে এখানে আমরা আলোচনা করব তাঁর কাজকর্মের ধারা ও পরিপ্রেক্ষিত, উন্নয়ন সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাঙালি জীবনের মানোন্নয়নে তাঁর সামগ্রিক অবদানের কথা।

বিধানচন্দ্র উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে স্বাধীনতা-পূর্ব কালের শেষ দশকে বিভিন্ন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রভাবে বাঙালি জীবনে যে বিপন্নতা দেখা দিয়েছিল তা থেকে বাঙালিকে মুক্ত করাই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে জরুরি কাজ। আবার একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বাস্তববাদী। স্বভাবতই তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে ঘন ঘন বক্তৃতা দিয়ে, গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা মতাদর্শের দোহাই দিয়ে বাঙালির দুর্দশা মোচন করা যাবে না, এ জন্য প্রয়োজন এক বৃহৎ ও ব্যাপক কর্মযজ্ঞের যা দ্রুত গতিতে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ঘটাবে এবং সেই সঙ্গে বাঙালি সমাজের চেহারাটা বদলে দেবে। অন্য ভাবে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের এক নিঃশব্দ বিপ্লব নিয়ে আসাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি প্রণয়ন করেন তাতে তিনি অগ্রাধিকার দেন পরিকাঠামোগত উন্নয়নে। বাস্তববাদী বিধানচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল তার কৃষির উন্নয়ন এবং শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং এ জন্য সর্বাগ্রে চাই উন্নত পরিকাঠামো। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জোর দেন উন্নত সেচ ব্যবস্থায়, অধিকতর বিদ্যুৎ উৎপাদনে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে, শিক্ষার সম্প্রসারণে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ণে। এ ছাড়া রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা নগরীর সমস্যার দিকেও তাঁর বিশেষ নজর ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সমস্যার মোকাবিলায় বিধানচন্দ্র কখনই অ্যাডহকিজম বা স্বল্পমেয়াদি সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রতিটি সমস্যাকেই তিনি দেখতেন দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষাপটে যে কারণে আজও বাঙালি তাঁর কর্মোদ্যোগের অনেক সুফল ভোগ করে চলেছে।

কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের বহুমুখী উদ্যোগের পরিণামে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং বাঙালির জীবনধারা অনেক বেশি আধুনিক ও উন্নত হয়ে ওঠে। পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ এগোতে থাকে। শিল্পে অগ্রগতির অনুকূল বিষয়গত অবস্থা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট উন্নতই ছিল। স্বাধীনতা-পূর্ব কাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শিল্প (যেমন চা শিল্প,

পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প ইতাদি) ছিল অগ্রণী অবস্থানে এবং তার ক্ষুদ্র শিল্প সুবিখ্যাত ছিল সারা দেশে। উপযুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত করে বিধানচন্দ্র এই ধারাটিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করেছিলেন, শিল্পোৎপাদনে সহায়তা করেছিল তাঁর উদ্যোগে তৈরি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তাঁর কঠোর শাসনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল যে কারণে তাঁর আমলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ কখনও সংঘর্ষের রূপ নেয় নি। অথবা শারীরিক নিগ্রহের স্তরে পৌঁছয় নি। এইজন্যই ~শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের হার ছিল ঊর্দ্ধমুখী এবং কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বা রুগ্ন হয়ে পড়ার রেওয়াজ ছিল না। অন্য দিকে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশকেই পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং ব্যাপক সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্দ্বারা কৃষি-উন্নয়নের সুযোগ বাড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা থেকে আলাদা করার ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তাঁরই আমলে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠন করা হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে স্কুল শিক্ষার দায়িত্বভার তুলে নিয়ে তা অর্পণ করা হয় এই নবগঠিত সংস্থার ওপর। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার লাঘব করার জন্য কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথিতযশা চিকিৎসক হিসাবে বিধানচন্দ্রের সজাগ দৃষ্টি ছিল সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকেও। তাঁর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়, জেলা হাসপাতাল ও মহকুমার হাসপাতালগুলি সম্প্রসারিত হয় এবং কলকাতার বিখ্যাত সরকারি হাসপাতালগুলি যাতে তাদের সুনাম অনুযায়ী পরিষেবা দিতে পারে সেদিকেও তিনি লক্ষ রাখেন। বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝেই সরকারি হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করতেন।

বিধানচন্দ্রের নগরায়ণের উদ্যোগের সার্থক পরিণতি ছিল দুর্গাপুর। অখ্যাত এক গ্রাম থেকে দুর্গাপুরের তিনি রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন এক আধুনিক শিল্পনগরীতে। আবার অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা মহানগরীর জনবসতির হার বিপদমাত্রা অতিক্রম করে গুরুতর এক সমস্যার সৃষ্টি করবে অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে চিন্তা করে দূরদর্শী বিধানচন্দ্র কল্যাণীকে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে রূপান্তরিত করে তাকে কলকাতার অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল করতে চেয়েছিলেন। একই উদ্দেশ্যে সমস্ত সমালোচনা উপেক্ষা করে তিনি লবণ হ্রদকে বাসোপযোগী এক নগর হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্রষ্টা বিধানচন্দ্র উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কলকাতা নগরীতে একদিন ভূখণ্ডের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং এই সমস্যার সমাধানে পথনির্দেশ করার জন্য তিনি সরকারি উদ্যোগে পঞ্চাশের দশকেই নব মহাকরণ ভবন নামে কলকাতার সর্বোচ্চ বহুতল বাড়িটি নির্মাণ করান। বলা বাহুল্য, এতদ্বারা তিনি পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক নগরজীবনেরও সূত্রপাত করেন।

বিধানচন্দ্রের এই কর্মযোগের মূল্য ও মহিমা বোঝার ক্ষমতা তাঁর সমকালীন বাঙালি সমাজের ছিল না। আবার যেহেতু কাজপাগল মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নানা কাজ ও পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং ফলত ঘন ঘন জনগণের দোহাই দিতেন না, হরদম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন না, প্রায় প্রতিদিনই সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়ে ফিতে কাটতেন না বা উদ্বোধনী ভাষণ দিতেন না সে কারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়। এমন কি.শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেও তাঁকে কর্তৃত্বপরায়ণ এক এলিট হিসাবে গণ্য করতেন। এই ভ্রান্ত ধারণা গড়ে ওঠার পিছনে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষেরও এক বড় ভূমিকা ছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বিরোধী দলের কোনও রাজনৈতিক নেতা তাঁকে অসামান্য কল্পনাশক্তি

ও কর্মশক্তি সম্পন্ন এক অনন্য রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ এক নির্ভেজাল বাঙালিপ্রেমী ও বড় মাপের মানুষ হিসাবেও তাঁকে স্বীকার করেন নি বিরোধী দলনেতারা। গুণাগুণ বিচার না করেই তাঁরা তাঁর প্রতিটি কাজের সমালোচনা করেছেন। এমন কি সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়ে ডঃ রায় যখন তাঁর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া পথের পাঁচালি ছবিটিকে সরকারি আওতায় নিয়ে এসে ছবিটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন তখনও সমালোচকদের রসনা তাঁকে রেহাই দেয় নি।

এই সব সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন রাজ্য কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করা। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী পক্ষের রাজনীতিকরা আশঙ্কা করেছিলেন যে বিধান রায়ের কর্মযজ্ঞের সুবাদে বাঙালি রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রাধান্য অটুট থাকবে দীর্ঘকাল ধরে এবং ফলত রাজ্য রাজনীতিতে তাঁরা পিছিয়েই থাকবেন। এইজন্যই বিধান রায়ের জীবিতকালে তাঁর কোনও কাজকে তাঁরা ভাল বলে স্বীকার করেন নি। তবে তাঁরা এ-ও বুঝেছিলেন যে বিধানচন্দ্রের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব ছিল এতই বড় মাপের যে তাঁদের সমালোচনার তীর তাঁর গায়ে লাগবে না। তাই বিধান রায়ের সমালোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা করলেও তাঁদের তীব্র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ এবং সরকারের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে। নিরন্তর প্রচার চালিয়ে এই দুই কংগ্রেস নেতাকে তাঁরা সমকালীন বাঙালি রাজনীতির খলনায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছিলেন রাজ্যবাসীর কাছে। এ ছাড়া বিধান রায়ের কোনও কোনও সহকর্মী মন্ত্রীকে অপদার্থ ও অসাধু হিসাবে প্রমাণ করতেও তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। এই পরিস্থিতিতে বিধান রায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৫৮ সালে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের তীব্র সমালোচনা করে যখন মন্ত্রিপদ ও দল ত্যাগ করেন। তখন বিরোধীরা আশা করেছিলেন যে রাজ্য কংগ্রেসে এবার ভাঙন দেখা দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি।

বস্তুত, বিরোধীদের বিক্ষোভ, আন্দোলন ও সমালোচনা সত্ত্বেও ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২-এর বিধানসভা নির্বাচনে, অর্থাৎ, বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন সব কটি বিধানসভা নিবার্চনেই কংগ্রেস নিরঙ্কু শ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং এই তিনটি নির্বাচনেই কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। ১৯৫২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস দখল করে মোট ২৩৮টি আসনেরর মধ্যে ১৫১ টি আসন, ১৯৫৭-এর নির্বাচনে মোট ২৫২ টি আসনের মধ্যে ১৫২ টি আসন এবং ১৯৬২ এর নির্বাচনে ২৫২টি আসনের মধ্যে ১৫৭টি। তবে কোনও নির্বাচনেই বিরোধীরা পর্যুদস্ত হন নি এবং প্রতি নির্বাচনেই তাঁরা কংগ্রেসকে কোনও না কোনও ভাবে ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। ১৯৫২-এর নির্বাচনে সাতজন কংগ্রেসি মন্ত্রী এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা পরাজিত হন,১৯৫৭-এর নির্বাচনে স্বয়ং বিধান রায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি আই প্রার্থী মহম্মদ ইসমাইলের কাছে প্রায় হারতে হারতে বেঁচে যান এবং এই ঘটনা কংগ্রেস সংগঠনকে এতই আতঙ্কিত করে যে ১৯৬২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ বিধান রায়ের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কার্যত জোর করে তাঁকে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করান। এই দুটি কেন্দ্রেই অবশ্য বিধানচন্দ্র জয়ী হন।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পর পর তিনটি নির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেস জয়ী হলেও তার জয় এসেছিল মূলত গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের সমর্থনে। শহরাঞ্চলের ভোটারদের একটা বড় অংশ এই তিনটি নির্বাচনেই কংগ্রেসকে সমর্থন করে নি। খোদ কলকাতা মহানগরীতেই মোট ছাব্বিশটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৯৫২ সালে

সতেরোটি,১৯৫৭ সালে আটটি এবং ১৯৬২ সালে চোদ্দটি আসন। লক্ষণীয় যে বিধানচন্দ্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল কিন্তু শহরাঞ্চলের তথা কলকাতা নগরীর মানুষই সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছিলেন অথচ কংগ্রেস সম্পর্কে বিরূপতা ছিল শহরাঞ্চলেই বেশি। এর কারণ এই যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ওপর বামপন্থীরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন এবং নগরাঞ্চলের শিল্পশ্রমিক শ্রেণীও বাম-রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস সম্পর্কে ক্রমশই বিরূপ হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে 'গ্রামাঞ্চলের যে জনসমর্থনের ভিত্তিতে কংগ্রেস পর পর নির্বাচনে জয়ী হয়ে চলেছিল তা প্রকৃতার্থে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, অর্থাৎ, কংগ্রেসের নির্বাচনী সাফল্য গ্রামাঞ্চলের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে তার নির্ভেজাল জনপ্রিয়তার সূচক ছিল না। প্রকৃত সত্য ছিল এই যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গোড়ার দিকে জমিদার শ্রেণীর এবং জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হওয়ার পরে ধনী ভূস্বামী ও জোতদারদের প্রবল দাপট ছিল। এঁদের নির্দেশ অমান্য করে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা বা সাহস ছিল না। এই গ্রামীণ এলিটের সহায়তায় প্রথম তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে গ্রামের ভোটের সত্তর থেকে পঁচাত্তর শতাংশ নিজের অনুকূলে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গ্রামীণ এলিটের ওপর এই নির্ভরতার কারণে কংগ্রেস কখনই গ্রামাঞ্চলে তৃণমূলের স্তরে পৌঁছনোর চেষ্টা করে নি এবং গ্রামে গ্রামে কোনও পোক্ত সংগঠন গড়ারও চেষ্টা করে নি। পরবর্তীকালে এ জন্য কংগ্রেসকে বড় রকমের মূল্য দিতে হয় এবং আজও এই মূল্য সে দিয়ে চলেছে।

অবশ্য এই ভুল ও ব্যর্থতার দায় বিধানচন্দ্রের ছিল না, কারণ দলীয় সংগঠন দেখাশুনো করার পূর্ণ দায়িত্ব ছিল কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষের হাতে এবং বিধানচন্দ্র কখনও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি। অতুল্য ঘোষের রাজনৈতিক বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কল্পনাশক্তিতে কোনও ঘাটতি ছিল না যে কারণে রাজ্য রাজনীতিতে অসীম ক্ষমতাধর হয়ে তিনি রাজ্যবাসীর কাছে 'বঙ্গেশ্বর' নামে পরিচিত হন এবং ১৯৫৭ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে নিজের যোগ্যতায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম সারির নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু সংগঠন পরিচালনায় ও কাজকর্মের ধারায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সামন্ততান্ত্রিক কায়দার অনুগামী যে কারণে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের এলিট নির্ভরতাকে তিনি প্রশ্রয়ই দিয়েছিলেন। বিধানচন্দ্র অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও বাধা দেন নি যেহেতু দলীয় সংগঠন ও প্রশাসনের মধ্যে ব্যবধানরেখা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি চিরদিন মেনে চলেছিলেন। তবে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল খুবই প্রখর, নিজের অধিকার ও কর্তৃত্বে কারুর হস্তক্ষেপই তিনি কোনও দিন বরদাস্ত করেন নি। এতৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন মুক্তমনের মানুষ এবং নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি তিনি কখনই উপেক্ষা করেন নি। আসলে তিনি ছিলেন একজন কাজের মানুষ, কাজপাগল মানুষ। একটি কাজ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হওয়াই ছিল তাঁর কাছে বড় কথা। তাই কাজের সময় তিনি নিজেকে সর্বেসর্বা বলে ভাবতেন না। কাজের পরিকল্পনা করতে গিয়ে, কাজ করতে গিয়ে অন্যের কথা তিনি ধৈর্য ধরে শুনতেন এবং অনেক সময় উচ্চপদস্থ আমলাদের পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজের মত বদলাতেন। এ ছাড়া সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার মতো গণতান্ত্রিক মানসিকতাও তাঁর ছিল। ১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে যখন কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তখন তার প্রস্তুতি-পর্বে প্রশাসনিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রায় বারো ঘন্টা সময় ধরে তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে কর্মীদের উৎসাহিত করতেন এবং অধিবেশনের আগের দিন অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থায় সারা রাত্রি জেগে তিনি সেখানে কাজ করেছিলেন।

বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নে যে বহুমুখী উদ্যোগ নেওয়া হয় তার সুফল লাভ করে স্বাধীনতার প্রথম পনেরো বছরে বাঙালি অনেক এগিয়ে যায়। বস্তুত, এই সময়টা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি জীবনের স্বর্ণযুগ। এই কালপর্বে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হত সচলতা ও কর্মচাঞ্চল্য। অফিসে-আদালতে কর্মীরা কাজে ফাঁকি দিয়ে গাল-গল্প করতেন না। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের মতো এমন হই-হট্টগোল,বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছিল না। সেখানে শিক্ষকেরা সামান্য মাইনে পেয়েও সযত্নে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন এবং ছেলেমেয়েরা চাকরি পেত, বেকার অবস্থায় বছরের পর বছর কাটিয়ে তাদের চোখের জল ফেলতে হত না। কলকাতা মহানগরী ছিল গর্ব করার মতো এক সুন্দর,পরিচ্ছন্ন শহর। তার রাস্তাঘাট ছিল পরিচ্ছন্ন ও গাড়ি চলাচলের উপযোগী এবং তার জন-পরিষেবামূলক ব্যবস্থা ছিল উন্নত মানের। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন জীবিকার মানুষ উপযুক্ত মূল্য নিয়েও লোক ঠকাচ্ছেন এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যেত না। বামপন্থীরা তখন বিরোধী দল হিসাবে মিটিং-মিছিল-হরতাল করতেন। কিন্তু ছিল না ঘেরাও, ছিল না যখন-তখন ট্রেন ও পথ অবরোধ। মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিলেন না, এমন কি একজন বেকার যুবকও স্বচ্ছন্দে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। এ সবই হয়েছিল বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বের গুণে।

তাঁর নেতৃত্বে ও ব্যক্তিত্বে যে সব গুণ ছিল এবং চিকিৎসক হিসাবে তাঁর যে অসামান্য খ্যাতি ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে গুলিকে কাজে লাগিয়ে বিধানচন্দ্র অনায়াসেই সমকালীন বাঙালি সমাজে এক জনমোহন নেতা (charismatic leader) হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু এতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। থাকলে তিনি দলীয় সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং দলীয় মঞ্চ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে জনগণের চোখের মণি হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি জনগণের কাছ থেকে একটু দূরে থেকে নিজের কাজ করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস-সচেতন বিধানচন্দ্র সম্ভবত অনুভব করেছিলেন যে জনমোহন নেতৃত্বের স্ফুলিঙ্গ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কিন্তু কর্মে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলে ইতিহাস সাদরে বরণ করে নেয়। এইজন্যই তিনি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ততদিন তাঁর নামে বিশেষ জয়ধ্বনি শোনা যেত না, কিন্তু তাঁর জীবনাবসানের দীর্ঘকাল পরে আজও ইতিহাস তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছে। বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হল এই যে তিনি কখনও মতাদর্শ নিয়ে মাতামাতি করেন নি এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টাও তিনি কখনও করেন নি। অথচ কার্যক্ষেত্রে তিনি বহু পরিষেবামূলক ও জনকল্যাণকর উদ্যোগকে সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। রাষ্ট্রীয় পরিবহন আর সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প যার ছিল দুই উজ্জ্বল উদাহরণ। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একালের বহু নেতার মতো বিধানচন্দ্র নিছক তত্ত্ববিলাসী ছিলেন না, তিনি বিশ্বাসী ছিলেন বাস্তব প্রয়োগে।

অবশ্য বিধানচন্দ্রের চিন্তাধারা ও কর্মসূচিতে কোনও সীমাবদ্ধতা ছিল না, তিনি কোনও ভুল করেন নি। এমন নয়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং তাঁর গৃহীত কর্মসূচিও ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে তাঁর প্রায় সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচিই ছিল নগরমুখী। নগরায়ণ, নগরজীবনের উন্নয়ন ও নগরসমাজে আধুনিকতার সঞ্চারকেই তিনি উন্নয়নের সমার্থক বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই কলকাতার নগরজীবনকে তিনি সবিশেষ উন্নত করছিলেন, সরকারি উদ্যোগে সর্বোচ্চ বহুতল বাড়ি তৈরি `করিয়ে তিনি আধুনিক নগর জীবনের সূত্রপাত করতে চেয়েছিলেন,কল্যাণী ও লবণহ্রদ এলাকায় কলকাতা নগরীর পরিপূরক দুই শহর তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং দুর্গাপুরে বন কেটে বসতের ব্যবস্থাই শুধু করেন নি,তাকে শিল্পনগরীর মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তাঁর

মতো একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রামোন্নয়ন তথা কৃষি উৎপাদনের দিকে যথেষ্ট নজর দেন নি। গ্রামের সমাজজীবনের বদ্ধাবস্থা ভেঙে তাতে সচলতা ও আধুনিকতা নিয়ে আসা যে ছিল খুবই জরুরি এ কথা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি আরও বুঝতে চাঁন নি বা বুঝতে পারেন নি যে বিলুপ্ত জমিদারি প্রথার গর্ভ থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যে জোতদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে তাদের আধিপত্যে আঘাত হানতে না পারলে গ্রামজীবনের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় এবং শুধু উন্নত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কারের। হয়ত তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তার মূলে ছিল রাজনৈতিক কারণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর আমলে কংগ্রেসের অনুকূলে ভোটের সংগ্রাহক ছিল জোতদার ও বৃহৎ চাষীরা। এইজন্যই হয়ত গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগে তিনি বিরত থাকেন এবং গ্রামীণ সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই শ্রেয়স্কর বলে মনে করেন। এ ছাড়া বিধানচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেন ১৯৫৬ সালে যখন বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কংগ্রেস রাজ্য দলের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে এবং সর্বদলীয় সম্মেলনের মাধ্যমে কোনও রূপ মতামত গ্রহণ না করেই তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনেকে সে সময় বিধানচন্দ্রের এই পদক্ষেপকে পাগলের কাণ্ডকারখানা বলে উপহাস করেছিলেন। তাঁরা বোঝেন নি যে কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে বা খামখেয়ালিপনায় বিধানচন্দ্র এই পদক্ষেপ নেন নি। পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমির অভাবে যে সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করেছিল তা উদ্বিগ্ন করেছিল বিধানচন্দ্রকে। তাছাড়া সেই মুহূর্তে এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প সম্প্রসারণের প্রশ্নটিও ছিল খুব জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে বাঙালির মঙ্গল হবে ভেবেই তিনি সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে স্বাতন্ত্র্যকামী বাঙালি এ জিনিস মানতে পারবে না। বস্তুতপক্ষে, জনমত ছিল এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোভাগে রেখে সব বিরোধী দলই এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। লক্ষণীয়, বিধান রায়ের এই প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলগুলিকে সর্বপ্রথম এক জোট হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন করার সুযোগ করে দেয় এবং এই বিচারেও বিধানচন্দ্রের প্রস্তাব তাঁর নিজ দলেরই যথেষ্ট ক্ষতি করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক মানসিকতারই পরিচয় দেন। সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন কলকাতা উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন অশোক সেন ও সমস্ত বিরোধী দল সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মোহিত মৈত্র । ডঃ রায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেন যে এই উপনির্বাচনকে তিনি সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হলে এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করে নেবেন। উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন এবং এই ফল ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধানচন্দ্র তাঁর সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

আজকের রাজনীতিকরা ভুল করলেও তা কখনও স্বীকার করেন না এবং নিজেদের জেদ ছাড়তে পারেন না। বিধানচন্দ্র পেরেছিলেন কারণ তিনি শুধু একজন রাজনীতিক বা মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক বড় মাপের মানুষ যিনি বাঙলা ও বাঙালিকে ভালবাসতেন এবং যাঁর কাছে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে অনেক বড় ছিল পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক স্বার্থ । অন্যভাবে বলা যায় যে ভুলত্রুটি তিনি যা-ই করুন না কেন এবং সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে যা-ই ঘটুক না কেন, বিধানচন্দ্র রায় নিজে কখনও মূল্যবোধ ও মঙ্গলমনস্কতা হারান নি। এর ফলে রাজনৈতিক স্তরে ও নগরবাসী শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি যতই সমালোচিত হন না কেন, সমকালীন বাঙালির আস্থা ছিল তাঁর ওপর। এ ছাড়া তাঁর নেতৃত্ব নিঃশব্দে অনুপ্রাণিত করেছিল তৎকালীন বাঙালি সমাজকে যে কারণে তাঁর সমকালীন বাঙালি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল তার মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ বজায় রাখতে। তাই স্বাধীনতার লগ্নে যে বাঙালি ছিল শঙ্কিত ও সংশয়াচ্ছন্ন, পনেরো বছরের মধ্যেই সে আশায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সঙ্গত কারণেই এই পনেরো বছরের ইতিহাস বাঙালির অগ্রগতির ইতিহাস, তার বিশ্বাস ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার ইতিহাস এবং এর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল বিধানচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। এইজন্যই বিধানচন্দ্রকে ইতিহাসে স্বীকৃতি দিতে হবে স্বাধীনতা-উত্তর স্বর্ণযুগের অগ্রদূত হিসাবে।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দুর্বল নেতৃত্ব

প্রায় পনেরো বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর কর্মরত অবস্থাতেই বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয় ১৯৬২ সালের ১ জুলাই যে দিনটি ছিল তাঁর জন্মদিন। বিধানচন্দ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে গোড়া থেকে একটানা যে দুজন মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের একজন কালিপদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যজন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কালিপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পুলিসমন্ত্রী। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে নিতান্ত নিরীহ ও সাদাসিধে বলে মনে হলেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট কড়া ধাতের মানুষ এবং সবিশেষ কৌশলীও। অন্যদিকে প্রফুল্ল সেন ছিলেন খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই দুজনের কঠোর সমালোচনায় বিরোধীরা ছিলেন নিত্যই মুখর। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ডঃ রায় চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেলে কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিসের হাতে নিগৃহীত হন কিছু সাংবাদিক এবং ডঃ রায় বিদেশে চিকিৎসা বন্ধ রেখে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এসে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। অন্য দিকে প্রফুল্লচন্দ্র সেন আগাগোড়াই খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং সেই সুবাদে অনেক সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়। তথাপি বিধানচন্দ্রের গভীর আস্থা ছিল এই দুজনের ওপর। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে ১৯৫২-এর নির্বাচনে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালিপদ মুখোপাধ্যায় এই দুজন মন্ত্রীই পরাজিত হন। কিন্তু ডঃ রায় এঁদের মন্ত্রী করার ব্যাপারে এতই আগ্রহী ছিলেন যে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ঘোরতর আপত্তি অগ্রাহ্য করে এবং কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশনামা পাশ কাটিয়ে এঁদের দুজনকে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিধান পরিষদে নির্বাচিত করিয়ে মন্ত্রী করা হয়।

স্বভাবতই বিধান রায়ের মৃত্যুর পর এই দুজন ব্যক্তিই মুখ্যমন্ত্রীপদের জন্য বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। তবে কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিল না (বস্তুত,প্রফুল্ল সেন তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করার অল্প দিন পরেই কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়)। তা ছাড়া বিধানচন্দ্র নিজেও প্রফুল্ল সেনকে মন্ত্রিসভায় দুই নম্বরের গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে প্রফুল্ল সেনই মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম দেখাশুনো করার দায়িত্ব পেতেন। কাজেই বলা চলে যে ডঃ রায় নিজেই প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই বিধান রায়ের মৃত্যুর পর কোনও বিতর্ক ছাড়াই প্রফুল্লচন্দ্র সেন সর্বসম্মতিক্রমে দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গের হাল ধরেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন এক বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। ছাত্র জীবনে বি এস সি পাশ করে তিনি বিলেত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঠিক এই সময়েই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং তিনি সব ছেড়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর ১৯২৩ সালে বন্যাত্রাণের কাজে তিনি আরামবাগ মহকুমার বড়ডোঙ্গল গ্রামে যান এবং পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে সেখানেই বাস করে গ্রামসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন ও ‘আরামবাগের গান্ধী’ নামে খ্যাত হন। কাজেই বিধান রায় তাঁর প্রতি অকারণে আকৃষ্ট হন নি।

তবে প্রফুল্ল সেনের দুর্ভাগ্য ছিল এই যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে (প্রায় পনেরো বছর) বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। কারণ সেকালে ভারতবর্ষের কোনও খাদ্যমন্ত্রীরই সুনাম জুটত না,পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই। মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে তখনও সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয় নি এবং ভূমি সংস্কারের ব্যাপারেও কোনও পরিকল্পিতউদ্যোগ

ছিল না। এ ছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিধানচন্দ্রের মতো কর্মযোগী মানুষও গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন না। ফলে বিধান রায়ের আমলেও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সঙ্কট এড়ানো যায় নি,বিশেষত শহর ও গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে এই সঙ্কট ছিল ব্যাপক ও তীব্র। বলা বাহুল্য, এই সঙ্কটজনিত ক্ষোভ ও সমলোচনার প্রায় সবটুকু আঁচই খাদ্যমন্ত্রীর গায়ে লাগত যে কারণে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন যখন মুখ্যমন্ত্রী হন তখন ইতিমধ্যেই ব্যর্থতার দায়ে তিনি এক বহু সমালোচিত ও ধিকৃত রাজনৈতিক নেতা,অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন নি। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী পক্ষ এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। গোড়া থেকেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রফুল্ল সেন ও তাঁর সরকারকে কোণঠাসা করতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের সামনে তাঁকে খলনায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়।

মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এক বড় অসুবিধা ছিল এই যে তাঁর সমসাময়িক অবস্থা ছিল যথেষ্ট প্রতিকূল। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল—এই পাঁচ বছর ধরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মনে রাখতে হবে যে এই সময়টা ছিল গোটা ভারতবর্ষের পক্ষেই এক নিদারুণ বিপন্নতা ও বিপর্যয়ের কাল। প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তিন মাস পরে চীন-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তার তিন বছর পরে ভারতবর্ষকে পাক-আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়। প্রথমটিতে ভারতবর্ষের লজ্জাজনক বিপর্যয়ে নগ্নভাবে প্রকট হয়ে পড়ে আমাদের জাতীয় সামরিক শক্তি তথা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা। অতঃপর দ্রুত এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় শক্তশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগে যে কারণে জাতীয় সম্পদের একটা বড় অংশ ব্যয় করা হতে থাকে সামরিকীকরণে। এর সুফল অবশ্য পাওয়া যায় পাক-ভারত যুদ্ধে,যে যুদ্ধে যথেষ্ট আধিপত্য বজায় রেখেই ভারতবর্ষ পাক-আগ্রাসনের মোকাবিলা করে। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে পর পর ঘটে যাওয়া এই দু'টি যুদ্ধের পরিণামে বিধ্বস্ত হয়ে যায় ভারতীয় অর্থনীতি। অন্য দিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে ব্যর্থতার আবর্ত তৈরি করে, ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। শিল্পনির্ভর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষি-উৎপাদনে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার পরিণামে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে,অর্থাৎ,প্রফুল্ল সেন যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক সেই সময়েই, সারা দেশ চরম খাদ্য সঙ্কটের মুখোমুখি হয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় বিকাশের হারের লক্ষ্যমাত্রা অন্তত পাঁচ শতাংশ ধার্য হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বিকাশের হার হয়েছে মাত্র এক শতাংশ। ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গও ছিল এই দুরবস্থার অংশভাক। আবার চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব তাত্ত্বিক নেতাই পুরানো কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে যান। ফলত নতুন কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই (এম)-কে তার বিপ্লবী চরিত্র প্রমাণ করে স্থিতিক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে হয়। এ সব কিছুর সরলার্থ এই যে পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের কাল আদৌ সুসময় ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুঃসময়ের মোকাবিলায় যে ধরনের বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় নেতৃত্ব এবং ইতিবাচক উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষমতা প্রফুল্ল সেনের ছিল না। তিনি ছিলেন একজন ভাল মানুষ এবং আজীবন গান্ধীবাদী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েও ভোগবিলাস ও জাঁকজমক তিনি যথাসম্ভব পরিহার করে চলতেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসাবে

তিনি ছিলেন নিতান্তই মাঝারি মাপের। জনসাধারণকে অতি সহজে আকৃষ্ট করার মতো যে গুণাবলী' বিধান রায়ের ব্যক্তিত্বে পরিলক্ষিত হত তা তাঁর ছিল না এবং নিজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশলও তাঁর জানা ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনচর্যা এবং স্পষ্টভাষণের প্রবণতা আপনা-আপনিই তাঁকে জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের তীব্র সমালোচনা ও প্রবল অপপ্রচারের স্রোতে তাঁর এই বিশ্বাস খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কট যখন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে তখন কাঁচা কলায় যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে বলে তিনি রাজ্যবাসীকে কাঁচা কলা খাওয়ার পরামর্শ দেন। সরল বিশ্বাসেই তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কৌশলী বিরোধী পক্ষ ব্যাপক প্রচার চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে এই পরামর্শ দিয়ে তিনি অন্নভোজী বাঙালিকে উপহাস করেছেন। ফলত তাঁর এই পরামর্শের জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে বিরূপ হন। অন্যদিকে — তাঁর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে এবং ইতিমধ্যে অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের এক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সদস্য হয়ে ওঠায় পশ্চিমবঙ্গে সরকার ও প্রশাসনে সিদ্ধান্তকরণ প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের হাত থেকে চলে যায় রাজ্য কংগ্রেস প্রধান অতুল্য ঘোষের হাতে। ইতিমধ্যে ১৯৬৪ সালে কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী বদলের উদ্যোগ নেওয়া হলে জওহরলাল নেহরু নিজে প্রফুল্ল সেনকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং রাজ্য কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠীও তখন প্রফুল্ল সেনকে মুখ্যমন্ত্রীপদ থেকে অপসারণের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। কিন্তু অতুল্য ঘোষ নিজে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীপদে প্রফুল্ল সেনকে রাখতে জওহরলালকে কার্যত বাধ্য করেন। স্বভাবতই এর পর থেকে প্রফুল্ল সেনের অতুল্য ঘোষের প্রতি আনুগত্য আরও বাড়ে। এ সব কিছুর ফল দাঁড়ায় এই যে এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার নয়, কংগ্রেস সংগঠনই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা এবং অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হন অতুল্য ঘোষ যে কারণে বাঙালি তাঁকে 'বঙ্গেশ্বর' আখ্যায় ভূষিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যতদিন বিধান রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ততদিন সরকার ও প্রশাসনে তিনিই ছিলেন শেষ কথা। তাঁকে কখনও রাজ্য কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে কোনও নির্দেশ বা পরামর্শ নিতে হত না। যাঁরা দল চালাতেন তাঁরা দলের সাংগাঠনিক ভাল-মন্দ নিয়ে একেবারেই হস্তক্ষেপ করতেন না। এতে সুবিধা ছিল এই যে দলের ঢাক পেটাতে তাঁকে প্রতিদিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হত না এবং সরকার পরিচালনায় তিনি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারতেন। আবার দলীয় নির্দেশে এবং দলীয় স্বার্থরক্ষার কথা বিবেচনা করে তাঁকে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হত না বলে তিনি শুধু যোগ্যতা বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ উঠত না। মনে রাখতে হবে যে তাঁর আমলে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও বিধুভূষণ মল্লিকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অপূর্বকুমার চন্দের মতো সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ হয়েছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রথম সভাপতি। তাঁরা কংগ্রেস দলের সদস্য বা সমর্থক ছিলেন এমন অভিযোগ আনার সাহস চরম কংগ্রেস বিরোধীদেরও হত না। নিয়োগ ও পদোন্নতিতে এইভাবে কোনও রাজনৈতিক পক্ষপাত থাকত না বলে উচ্চপদস্থ আমলারাও কেউ চাটুকারিতা করতেন না এবং মুখ্যমন্ত্রীর মতামতের বিরোধিতা করার মতো সাহসও তাঁরা দেখাতে পারতেন। প্রফুল্ল সেনের আমলে এই ধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই অবশ্য তিনি মন্ত্রিদের হাতে নিজেদের বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন,অর্থাৎ,মন্ত্রিদের তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেন এবং এই নিয়মও চালু

করে দেন যে বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া কোনও অফিসার কোনও ফাইল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর শাসনকাল পর্বে ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে যে দলের সাংগঠনিক স্তরের সর্বোচ্চ নেতা অতুল্য ঘোষই সরকার ও প্রশাসনের প্রকৃত চালক এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যত মানুষের ভিড় তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক কৃপাপ্রার্থীর ভিড় অতুল্য ঘোষের আশেপাশে। এই কৃপাপ্রার্থীদের মধ্যে থাকতেন সর্বস্তরের মানুষ, যেমন, উকিল, ডাক্তার, অধ্যপক, শিক্ষক,খেলোয়াড়,সাংবাদিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী,এমন কি সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দিনের শুরু এখান থেকেই। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণ ভোট দিয়ে সরকার গঠন করে দেয় তাদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার আশায়। কিন্তু দল যদি নিরন্তর সরকারের ওপর খবরদারি করে তা হলে সাধারণ স্বার্থের ওপরে স্থান পায় দলীয় স্বার্থ এবং অনিবার্যভাবেই বিঘ্নিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ। বলা বাহুল্য, দুর্নীতিও আসে এই পথ দিয়ে। কারণ দল প্রধান যখন সরকারের প্রধানের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করে তখন সে ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার প্রয়োগ সবার্থেই দুর্নীতি। দ্বিতীয়ত, দলের সদর দপ্তর যখন সরকারের নিয়ন্তা এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে দলীয় স্বার্থেই যখন অগ্রাধিকার তখন সরকারি কাজকর্মে, নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকরণে ও জন পরিষেবা ব্যবস্থায় দলীয় পক্ষপাত দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য,এই পক্ষপাত দুর্নীতিরই অন্য নাম।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনৈতিক পক্ষপাতজনিত এই দুর্নীতি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন প্রফুল্ল সেনের শাসনকালে। এই দুর্নীতি অবশ্য ব্যাপক ছিল না। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গবাসীর এ সম্পর্কে কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না সে কারণে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও দুর্নীতি তাঁদের ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী না হয়েও দলপ্রধান হিসাবে অতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠাতেও তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। সঙ্গত কারণেই তাঁরা ভাবতে শুরু করেন যে সমাজে,শাসনব্যবস্থায় ও রাজ্য রাজনীতিতে অতুল্য ঘোষের এই নজিরবিহীন প্রভুত্ব গণতন্ত্রকে প্রহসনে পর্যবসিত করে পশ্চিমবঙ্গের চরম সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। তাঁদের এই আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রশমিত হতে পারত যদি প্রফুল্ল সেন বিধান রায়ের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক কর্মযোগী হতেন, যদি পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকত। কিন্তু সে যোগ্যতা প্রফুল্ল সেনের ছিল না। তা ছাড়া তাঁর মন লালিত হয়েছিল গান্ধীবাদী আদর্শে যে কারণে আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর কোনও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। অবশ্য গ্রামসমাজকে তিনি ভাল বুঝতেন এবং বিধান রায়ের মতো তিনি নগরমুখী ছিলেন না। কিন্তু গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি-উন্নয়নের মোড় ঘোরাবার মতো কোনও বড়ও কর্মকাণ্ড তিনি শুরু করতে পারেন নি। এ ব্যাপারে কংগ্রেস রাজনীতিই ছিল তাঁর সামনে এক বিষম বাধা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অতুল্য ঘোষের উৎসাহে ও উদ্যোগে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাঙলার গ্রামসমাজে উদ্ভব হয়েছিল সম্পন্ন চাষী ও জোতদারদের সমন্বয়ে এক গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর যারা ছিল কংগ্রেসের গ্রামীণ ভোট ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধায়ক ও পাহারাদার। গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে স্থিতাবস্থা ভেঙে ক্ষমতাশালী এই শ্রেণীকে উৎখাত করতে চাইলে বাধা আসত স্বয়ং অতুল্য ঘোষের কাছ থেকেই এবং অতুল্য ঘোষের পক্ষে প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা কোনও মতেই অসম্ভব ছিল না। কারণ অতুল্য ঘোষই ছিলেন রাজ্য কংগ্রেস দলের প্রকৃত রাজনির্মাতা (king maker) এবং তদানীন্তন রাজ্য কংগ্রেসে প্রফুল্ল সেনের একটি বিরুদ্ধ গোষ্ঠীও ছিল। অতএব প্রফুল্ল সেন নিষ্ক্রিয় থাকাই নিরাপদ বলে মনে করেন, যদিও এই নিষ্ক্রিয়তা তাঁর নেতৃত্বকে যথেষ্ট খাটো করে দেয়।

প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই জনসমক্ষে তাঁর এই দুর্বল নেতৃত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে পয়গম্বরের পবিত্র কেশ চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সে সময় এ আই সি সি -র অধিবেশনে যোগ দিতে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলেন। রাজ্য কংগ্রেসেরই কোনও কোনও প্রফুল্ল সেন বিরোধী নেতার অনুরোধক্রমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ অবিলম্বে কলকাতায় আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর অবর্তমানেই তিনি পুলিশ কমিশনার এস এম ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং কলকাতা পুলিশের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ দেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর অবর্তমানে গুলজারি নন্দের এই পদক্ষেপ কতটা সংবিধানসম্মত ও শিষ্টাচার সম্মত ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র এ বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে পারেন নি শুধু তাই নয়,রাজ্য কংগ্রেসেরই কেউ কেউ এস এম ঘোষকে পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যে চাপ দেন সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এই সৎ পুলিশ অফিসারকে অবিলম্বে সরিয়ে দিতেও তিনি বাধ্য হন। আবার এই ১৯৬৪ সালেই কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অজয় মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিপদত্যাগ করলে তাঁকে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়। কিন্তু অতুল্য ঘোষের অনুগামী ও রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা ও দুর্ব্যবহার অজয় মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে। অবশেষে কুমার সিংহ হলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভায় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। এবং ক্ষুব্ধ,অপমানিত অজয় মুখোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কংগ্রেস নামে পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন দল গঠন করেন যে দল ১৯৬৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম লড়াইয়ে নেমে ৩৫ টি আসন দখল করে। অজয় মুখোপাধ্যায়ের এই কংগ্রেস ত্যাগ রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষে ছিল চরম ক্ষতিকর। বস্তুত, অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে সময় যদি রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা ঐ রূপ দুর্ব্যবহার না করতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির পরবর্তী ইতিহাস সম্ভবত অন্য রকম হত। প্রফুল্ল সেন পরে সে কথা স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক মারাত্মক ভুল। আরও উল্লেখ্য যে প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বের অক্ষমতা ও নিষ্ক্রিয়তায় বাঙালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিধানচন্দ্র রায় যে গতিশীলতা এনেছিলেন তা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং সর্বত্রই চালাকি ও ফাঁকিবাজি দেখা দিতে থাকে। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় বাঙালি জীবনে সেগুলির প্রভাব পড়তে থাকে এবং সর্বভারতীয় অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৯৬৬ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে দেখা দেয় খাদ্যসঙ্কট। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এই সঙ্কটের মোকাবিলায় প্রফুল্ল সেন অবশ্য যোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক দৃঢ়তায় অন্তত বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় এই সঙ্কটের তীব্রতা অনুভূত হয় নি। তবে ইত্যবসরে বিরোধী পক্ষ প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বের দুর্বলতা ও অক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে নানা ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্যস্তরে বামপন্থীরা তাঁদের র‍্যাডিকাল রাজনীতির পোক্ত ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন নি,এমন কি উদ্বাস্তু আন্দোলনে ও খাদ্য আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেও তাঁরা ভোটযুদ্ধে ছিলেন খুবই পিছিয়ে। অবশ্য প্রথম সারির বামপন্থী নেতারা, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গ নিজেদের অনাড়ম্বর জীবনচর্যা ও রাজনৈতিক সততার ·কারণে জনসাধারণের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন। তাঁদের জনসভায় বাস ও লরি সহযোগে লোক জড় করতে হত না, লোকে আপনাআপনিই ভিড় করত এবং তাঁদের কথা

মনোযোগ দিয়ে শুনত। প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই নেতৃবর্গ বিধান রায়ের মন্ত্রিসভার সঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভার গুণগত পার্থক্য সহজেই বুঝে যান। ফলে কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণের ধার অনেক বেড়ে যায়। এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তাঁরা বেছে নেন অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনকে। তাঁরা নানাভাবে তাঁদের নাস্তানাবুদ করতে সচেষ্ট হন এবং অবিরাম মিথ্যা প্রচার চালিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র হননেও প্রবৃত্ত হন। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের রাজনীতিতে মূল্যবোধ হারানোর সূত্রপাত হয় এইভাবেই। লক্ষণীয় যে, বামপন্থীরা রাজনৈতিক স্বার্থে যে সব মিথ্যা প্রচার চালাতে থাকেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ তা সহজেই বিশ্বাস করতে থাকেন। এর কারণ হল এই যে, বিধান রায়ের কর্মতৎপরতা দেখে বাঙালির প্রত্যাশা বেড়েছিল অনেক এবং প্রফুল্ল সেনের মতো তুলনামূলক ভাবে খর্বাকৃতি রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এই প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব ছিল না বলে জনসাধারণ প্রফুল্ল সেনের ওপর অনেকাংশেই আস্থা হারিয়েছিলেন। আবার অতুল্য ঘোষের সর্বগ্রাসী প্রভুত্বও বাঙালি পছন্দ করে নি। তাই প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের পর্বেই এমন একটা সময় আসে যখন অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন উভয়েই পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে খলনায়কে পরিণত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জওহরলাল নেহরুর মতোই বিধান রায়ের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিল প্রখর। তিনি বিরোধী পক্ষকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং বিরোধী দল নেতা হিসাবে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। স্বভাবতই বিধান রায়ের শাসনকালে সরকার পক্ষের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের একটা ন্যূনতম সুসম্পর্ক বজায় ছিল।প্রফুল্ল সেনের আমলে এই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন এই দুজনেই আদর্শগত কারণে ছিলেন চরম কমিউনিস্ট-বিরোধী। এই প্রেক্ষাপটে স্বভাবতই রাজ্যের দুই প্রধান বিরোধী দল সি পি আই ও সি পি আই(এম)-এর সঙ্গে প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ষাটের দশকের মধ্য ভাগে চীন-বিরোধী জনমতের সুযোগ নিয়ে এবং অবশ্যই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতাদের আটক করা হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা আহত বাঘের মতো সরকার ও শাসকদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।) ইতিমধ্যে অপমানিত,লাঞ্ছিত রাজ্য কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল বাংলা কংগ্রেস গঠন করায় রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ সব কিছু মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে স্বভাবতই একটা সরকার-বিরোধী আবহাওয়া তৈরি হয় এবং তারই ফলস্বরূপ ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় এক ব্যাপক বিরোধী আন্দোলন। রাজ্যের বামপন্থী নেতৃবর্গের অনেকেই তখন ছিলেন কারান্তরালে। কাজেই এই আন্দোলন পরিচালনার সুযোগ তাঁদের ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে তখন ক্ষোভ এত প্রবল যে এই আন্দোলন কার্যত এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের চেহারা নেয়। বস্তুত, কার্যত অসংগঠিত এই প্রতিবাদী আন্দোলনের তীব্রতা দেখে বামপন্থীরাও বিস্মিত হয়ে যান এবং প্রফুল্ল সেন আটক থাকা বামপন্থী নেতাদের ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার জন্য তাঁদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় যে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমাণে তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অতঃপর আনুষ্ঠানিক ভাবে এই জনপ্রিয়তা হারানোর ঘটনা প্রমাণিত হয় ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সংসদীয় ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে। এই নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সি আই প্রার্থী এবং বাঙালি রাজনীতিতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম পরিচিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জে

এম বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হন অতুল্য ঘোষ, আরামবাগ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে ৮০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন 'আরামবাগের গান্ধী' প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং রাজ্যস্তরের আরও অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা পরাজিত হন আর মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ১২৭ টি আসন পেয়ে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। নির্বাচনের এই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসি ও যুক্তফ্রন্ট নামাঙ্কিত কোয়ালিশন সরকার অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করে ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ। এইভাবেই প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান হয় এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একটানা কুড়ি বছরের শাসনে ছেদ পড়ে।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভ্যুদয় ও পতন

স্বাধীনতার প্রথম কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। তারা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। বিরোধীদের মধ্যে এই ভোট বিভাজনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন না পেয়েও বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী হতে পেরেছিল। বিরোধী ঐক্য সম্ভবপর হয় নি দুটি কারণে। প্রথমত,স্বাধীনতা যখন আসে তখন কংগ্রেসের তুলনায় অকংগ্রেসি দলগুলি ছিল নিতান্তই দুর্বল। স্বভাবতই তাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য একশ ভাগ বজায় না রেখে তাদের পক্ষে এই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব ছিল না। বিরোধীদের ঐক্যের জন্য সচেষ্ট না হওয়ার পিছনে এ-ই ছিল এক বড় কারণ। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তী কুড়ি বছরে তার মতাদর্শ ও গণ-সংযোগের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী শিবিরে কমিউনিস্ট পার্টিই প্রধান দল হয়ে ওঠে। কিন্তু ষাটের দশকে পার্টি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের দুই কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই ও সি পি আই (এম)-এর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈরিতা চরম আকার ধারণ করে এবং পশ্চিমবঙ্গে এ-ই হয়ে ওঠে কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্যের পক্ষে এক প্রবল অন্তরায়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জন বিক্ষোভ, বিস্ফোরিত হয় তা দেখে বিরোধী পক্ষ বুঝতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পায়ের তলায় জমি সরতে শুরু করেছে এবং এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের পক্ষে মিলেমিশে কংগ্রেসকে রাজ্যস্তরে হারানো সম্ভব। তথাপি (১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীরা একজোট হতে পারে নি। তারা জন সংযুক্ত বাম মোর্চা (PULF) এবং সংযুক্ত বাম মোর্চা (ULF)— এই দুই পৃথক জোট হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দল ছিল প্রথম জোটে আর সি পি আই(এম), আর এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি আই, ওয়াকার্স পার্টি ইত্যাদি দল ছিল দ্বিতীয়টিতে। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও অব্যাহত ছিল দুই জোটের পরস্পরের প্রতি বিষোদগার। সি পি আই(এম) রাজ্য দলের সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সি পি আই নেতা সোমনাথ লাহিড়ির নির্বাচনে জামানত জব্দ করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন প্রকাশ্যে। অন্য দিকে সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারাও সি পি আই (এম) সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন অনেক।

নির্বাচনে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কংগ্রেসি বিপর্যয় ঘটাতে পারলেও এই দুই জোট কিন্তু বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ইউ এল এফ-এর পক্ষে ৪৩টি আসন পেয়ে সবচেয়ে ভাল ফল করেছিল সি পি আই(এম) এবং পি ইউ এল এফ-এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল ফল করেছিল বাংলা কংগ্রেস ৩৫ টি আসন পেয়ে। পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও ২৮০ টি আসনের মধ্যে ১২৭ টি আসন পেয়ে কংগ্রেসই হয় একক বৃহত্তম দল এবং যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতার লক্ষ্যমাত্রা থেকে তার ব্যবধান ছিল মাত্র চোদ্দটি আসনের সে কারণে কিছু ছোট দলকে মন্ত্রিত্ব উপঢৌকন দিয়ে অথবা বাংলা কংগ্রেস ভেঙে সরকার গঠন করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বস্তুত, বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তাই চেয়েছিলেন। সে সময় কংগ্রেস সরকার গঠনের জন্য খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিজয় সিং নাহার, শৈল মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মজুমদার প্রমুখ নেতৃবর্গ যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সব উৎসাহ-উদ্যোগে জল ঢেলে দেন কংগ্রেস

নেতা অতুল্য ঘোষ। বিরোধীদের প্ররোচনায় জনসাধারণের দ্বারা প্রবলভাবে ধিকৃত হলেও তিনি যে আজকের নেতাদের মতো মূল্যবোধ হারিয়ে ও ক্ষমতার লোভে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময়ে। বিচক্ষণ এই নেতা নির্বাচনের ফলাফল দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে কংগ্রেস তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে এবং এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে তা স্থিতিক্ষম হতে পারবে না এবং দলের চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে অকংগ্রেসি দলগুলির মধ্যে মতাদর্শের ফারাক এত বেশি এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়া এত কম যে অকংগ্রেসি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও তা অল্প দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়বে, অর্থাৎ, আপাতত বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকলে ক্ষমতা আবার কংগ্রেস দলের কাছেই ফিরে আসবে। তাই ১৯৬৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে অকংগ্রেসিরা ১৪০ টি আসনে জয়ী হয়েছে তখন কিছু ফল প্রকাশ বাকি থাকা সত্ত্বেও সেই রাত্রেই মূলত অতুল্য ঘোষের উদ্যোগে রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক নির্মলেন্দু দে-র নামে একটি বিবৃতি দিয়ে রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার জন্য কংগ্রেস এবার বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করবে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকার গঠনের এই অনিচ্ছা ব্যক্ত হওয়ার ফলে সঙ্গত কারণেই পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসি সরকার গঠনের পথ প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখেই নির্বাচনী ফলাফলের প্রাথমিক প্রবণতা দেখে হুমায়ুন কবির নিশ্চিত হয়ে যান যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অকংগ্রেসি সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় দীর্ঘদিনের পারস্পরিক তিক্ততা ভুলে সি পি আই ও সি পি আই (এম) -এর রাজ্য নেতৃবর্গ একই টেবিলে সরকার গঠনের আলোচনা শুরু করেন ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে। অতঃপর ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অকংগ্রেসি দলগুলির ও নির্বাচিত নির্দল প্রার্থীদের নিয়মিত বৈঠকের পরিণামে পি ইউ এল এফ, ইউ এল এফ, অন্য কয়েকটি অবংগ্রেসি দল ও নির্দল প্রার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট নামে একটি অকংগ্রেসি কোয়ালিশন যার নেতা হিসাবে বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম একটি অকংগ্রেসি সরকার গঠন করেন। সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু হন এই মন্ত্রিসভায় অর্থ ও পরিবহন মন্ত্রী এবং খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের দায়িত্ব নেন নির্দল বিধায়ক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা তখন তুঙ্গে। বিরোধী পক্ষের নিরন্তর প্রচার ও অপপ্রচারের প্রভাবে ইতিমধ্যেই তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে জোতদার, সম্পন্ন ভূস্বামী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক কংগ্রেস সরকার রাজ্যবাসীকে অপশাসন ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। স্বভাবতই যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যাশা হয় আকাশচুম্বী। তাঁরা এই সরকারকে জনগণের সরকার হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এই আশা পোষণ করতে থাকেন যে গুণগত দিক থেকে কংগ্রেস সরকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই কোয়ালিশন সরকারের সুশাসনে পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই সোনার বাঙলা হয়ে উঠবে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা সরকারে এসেছিলেন ঋজু এক মতাদর্শগত অঙ্গীকার নিয়ে এবং 'রাজ্য ও রাজ্যবাসীর ভাল করার সদিচ্ছাও তাঁদের ছিল। তা ছাড়া তাঁদের চালচলন ও কাজকর্মের ধারাও ছিল অন্য ধরনের। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নিজের হাতে জামাকাপড় কেচে পরতেন এবং কোনও মন্ত্রীই সিকিউরিটি পরিবেষ্টিত হয়ে আমীরি চালে থাকতেন না। তাঁরা সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষের মতো এবং তাঁদের কেউই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিলেন না। উল্লেখ্য যে নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ৭ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত তার দ্বিতীয় বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেয় যে মুখ্যমন্ত্রী সহ সব মন্ত্রীই কম বেতন নেবেন এবং সব মন্ত্রীর ঘর থেকে ঠাণ্ডা

মেশিন সরিয়ে দেওয়া হবে। আরও উল্লেখ্য যে নতুন মন্ত্রীরা পূর্বতন মন্ত্রীদের মতো শুধু দপ্তরে বসে ফতোয়া জারি করতেন না, প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁরা সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার অল্প দিন পরেই কলকাতার বাগমারি অঞ্চলে কলকাতাবাসী শিখ সম্প্রদায়ের এক ধর্মীয় মিছিলকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় এবং পরিস্থিতি এতই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্টের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী সত্বর ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি সামাল দেন। মহাকরণের আরাম ঘর ছেড়ে মন্ত্রীদের পথে নামতে দেখে জনসাধারণও উদ্বুদ্ধ হন।

তবে এই সরকারের পক্ষে সোনার বাঙলা গড়ে তোলা যে সম্ভব হবে না তা অল্প দিনের মধ্যেই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের চোখে ধরা পড়তে থাকে। আসলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়ার মতো শক্তি ও সামর্থ্য তার ছিল না। কেন ছিল না তা বুঝতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ও খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছাড়া অন্য কারুরই সরকার চালানোর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। এঁরা বিরোধী আন্দোলনে দড় ছিলেন, অর্থাৎ, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিতে পারতেন, হরতাল ডেকে সব কিছু বন্ধ করে দিতে পারতেন, ভাঙতে পারতেন, কিন্তু কীভাবে গড়তে হয় তা তাঁরা জানতেন না। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁরা সরকারি ক্ষমতায় এসেছিলেন বলে নিজেদের যথোপযুক্ত ভাবে তৈরি করার সুযোগ তাঁরা পান নি এবং সম্ভাব্য সরকার সম্পর্কে আগে থেকে তৈরি করা কোনও ব্লু প্রিন্টও তাঁদের হাতে ছিল না। অথচ নির্বাচন উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে তাঁরা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনেক। । তৃতীয়ত, যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থীদের মতাদর্শগত চেতনা তখন ছিল খুবই প্রখর। স্বভাবতই পুলিশ ও আমলাবর্গকে তাঁরা বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার শোষনযন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সরকারে থেকেও সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ পুলিশ ও আমলাদের সঙ্গে তাঁদের বিচিত্র এক অবিশ্বাস ও বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। অন্য দিকে শ্রমমন্ত্রী ও এস ইউ সি আই নেতা সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতাদর্শাশ্রয়ী প্রশ্রয়ে ও প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায়, অফিসে-আদালতে দাবি আদায়ের কৌশল হিসাবে প্রবর্তিত হয় ঘেরাও অনেক ক্ষেত্রে যার বাড়াবাড়ি মানবিকতা ও ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে। এর ফলে রাজ্যের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং পরিণামে মার খেতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি। চতুর্থত, সি পি আই (এম) প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী সংগঠন যুক্তফ্রন্ট সরকারের এক বড় সমর্থক ছিল বলে অন্তত সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে কর্মচারীদের যে কোনও মূল্যে খুশি রাখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য পালনে শিথিলতা দেখা দিতে থাকে। বস্তুত, এই সময় থেকেই সরকারি অফিসে ওয়ার্ক কালচার নষ্ট হতে শুরু করে। এ ছাড়া কর্মচারীদের খুশি করতে গিয়ে জরুরি প্রয়োজনীয় কাজও উপেক্ষিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষমতায় আসার অল্প দিনের মধ্যেই পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্যোগে বিদেশি ট্রাম কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থা অধিগ্রহণ করা হয় এবং এটি নিঃসন্দেহে ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের এক ঐতিহাসিক কীর্তি। তবে এর পরে সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল ট্রাম চলাচল ব্যবস্থার উপযুক্ত উন্নয়নে। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরকার ট্রাম কর্মীদের খুশি করতে সচেষ্ট হয়। তাই অধিগ্রহণের পর জ্যোতি বসু ট্রাম রাস্তা মেরামতির জন্য বরাদ্দ সব টাকাটাই ব্যয় করেন ট্রামকর্মীদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিতে। পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার দুমাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গের

নকশালবাড়ি অশান্ত হয়ে ওঠে এক অতি র‍্যাডিক্যাল কৃষক আন্দোলনে। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা এক সময়ে সি পি আই (এম)-এরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু দলকে সংসদীয় রাজনীতির সরল রাস্তায় এগোতে দেখে তাঁরা সি পি আই (এম)কে শোধনবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে দল ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং নিজেদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করেন নকশালবাড়িতে। স্বভাবতই নকশালবাড়ির ঘটনা সি পি আই(এম)-এর পক্ষে ছিল চরম অস্বস্তিকর এবং কীভাবে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করা হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও নীতি ও অবস্থান যেমন ছিল না সি পি আই (এম)-এর তেমনই ছিল না যুক্তফ্রন্ট সরকারের। ফলত পরবর্তী কয়েক বছরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতায় পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে তার আরম্ভের পর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে নিজের অক্ষমতার পরিচয় রাখে।

এছাড়া যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত গতিতে কাজ করার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল এই যে নামে যুক্তফ্রন্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আদৌ যুক্ত ছিল না, অর্থাৎ, কোয়ালিশনের শরিকদের মধ্যে কোনও পারস্পরিক বিশ্বাস বা আস্থা ছিল না, তাদের ছিল না কোনও ঐক্যবোধ। সি পি আই(এম) বাংলা কংগ্রেস প্রমুখ অ-বাম শরিকদের একেবারেই বিশ্বাস করত না। আবার বামদের মধ্যেও কোনও আন্তরিক সৌহার্দ্য ছিল না। সি পি আই (এম) ফরওয়ার্ড ব্লক,সি পি আই, আর এস পি প্রমুখ বাম শরিকদের ভিতরে ভিতরে সন্দেহের চোখে দেখত। মাঝে মধ্যেই বৈঠক আর মিটিং-মিছিল করে শরিকরা তাদের ভাই-ভাই নীতি অটুট থাকার কথা ঘোষণা করলেও খাদ্য নীতি ও নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের ছবিটা প্রায় গোড়া থেকেই জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে একজন জোতদার ও তাঁর অধীনস্থ ভাগচাষীর মধ্যে বিরোধের পটভূমিতে একদল সশস্ত্র কৃষকের দ্বারা আক্রান্ত হন উক্ত জোতদার এবং এইভাবেই গোলমালের সূত্রপাত হয় নকশালবাড়িতে। গোলমাল থামাতে ও বিরোধ মেটাতে সক্রিয় হয় পুলিশ। অতঃপর ২৪ মে শান্তিপূর্ণ বিরোধ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে আন্দোলন কারী কৃষক ও কৃষক নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে এক পুলিশ বাহিনী যখন ফিরে আসছিল তখন পিছন থেকে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ বাহিনীর উপর আন্দোলনকারীরা আক্রমণ চালান। এতে চারজন পুলিশ আহত হন। পরদিন তাঁদের মধ্যে একজন মারা গেলে উত্তেজিত পুলিশ আন্দোলনকারীদের(অল্পকাল পরেই যাঁরা নকশালপন্থী নামে খ্যাত হন) ওপর গুলি চালায়। এতে একজন শিশু সহ পাঁচজন মহিলা মারা যান। ২৭ মে মুখ্যমন্ত্রী নকশালবাড়িতে জনসভা করে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে তিনি কৃষকের জোর করে জমি দখলের লড়াইকে সমাজবিরোধী কাজ বলে অভিহিত করেন এবং পুলিশের গুলি চালনাকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করেন। অন্যদিকে ২৬ মে তারিখেই সি পি আই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত পুলিশি গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করে একে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমোদ দাশগুপ্তের এই কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে অবাস্তব বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এইভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ মত ভেদ ক্রমশই বাড়তে থাকে। ঠিক এই সময়েই ১৯৬৭ সালের ১ জুন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর স্থলাভিষিক্ত হন রাজ্যপাল ধর্মবীর।

একদিকে যখন নকশালবাড়ি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হতে শুরু করেছে অন্যদিকে তখন নতুন সরকারের খাদ্যনীতিকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ গোলমাল ক্রমবর্ধমান। নির্বাচনের আগে অকংগ্রেসিদের, বিশেষত বাম দলগুলির, নির্বাচনী প্রচারে মূল উপজীব্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা সমাধানে কংগ্রেস সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং ক্ষমতায়

এলে তাঁরা অনায়াসে যে এই সমস্যার সমাধান করবেন সে সম্পর্কেও ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই খাদ্যসঙ্কট মোচন ছিল নবগঠিত সরকারের কাছে একবড় চ্যালেঞ্জ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য নয় যে ৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে খাদ্যই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। অতঃপর বৈঠকের পর বৈঠক করে যুক্তফ্রন্ট সরকার, ২২ মার্চ দিল্লি গিয়ে অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু ও প্রফুল্ল ঘোষ বাড়তি চাল ও গমের জন্য দরবার করেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রামের কাছে, এপ্রিল মাসে মন্ত্রীরা স্বয়ং জেলায় জেলায় ধানচাল সংগ্রহে বের হন এবং মে মাসের মধ্যভাগে সরকারের উদ্যোগে শুরু হয় রাজ্যব্যাপী মজুত উদ্ধার আন্দোলন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা বেড়েই চলে এবং চালের দর হয় কিলো প্রতি পাঁচ টাকা। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের শরিকরা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনায়াসে খাদ্যসমস্যার সমাধান করে বাঙালিকে দুধে-ভাতে রাখার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু এই ব্যর্থতার দায় স্বীকারের সৎ সাহস কোনও কোনও দলের ছিল না, অন্তত সি পি আই (এম)-এর তো ছিলই না। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যে রাজ্য জুড়ে যখন চাল,আটা নিয়ে হাহাকার পড়ে গেছে তখন সি পি আই(এম) নেতৃবর্গ প্রচার শুরু করেন যে কেন্দ্র উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পশ্চিমবঙ্গকে সরবরাহ করছে না বলেই রাজ্যের এই খাদ্যসঙ্কট। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ সি পি আই(এম)-এর যুক্তি মানতে না চাওয়ায় সি পি আই(এম) অবশেষে খাদ্য সম্পর্কিত ব্যর্থতার সব দায় চাপিয়ে দেয় খাদ্যমন্ত্রীর ওপর। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন সর্বভারতীয় সি পি আই(এম) নেতা পি সুন্দরায়া। মে মাসের শেষ দিকে দার্জিলিংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করেন যে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগ করা উচিত কারণ খাদ্য সমস্যা সমাধানে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। রুষ্ট প্রফুল্ল ঘোষ স্বভাবতই এতে সি পি আই (এম) সম্পর্কে চরম বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং অনুভব করতে থাকেন যে সরকারে থেকে সি পি আই (এম)-কে সঙ্গে নিয়ে কোনও কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙনের বীজ বপন করা হয় এইভাবেই।

ইতিমধ্যে রাজ্য কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে নিয়ে এসে নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে । অতুল্য ঘোষের এতে সায় ছিল না বটে, কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টাও তিনি করেন নি। ফলত খগেন দাশগুপ্ত, বিজয় সিং নাহার, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শৈল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে তাঁদের পিছনে মদত ছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আর বিধায়ক যোগাড় করার কাজে মুখ্য ভূমিকা নেন রাজ্য বিধানপরিষদের কংগ্রেস সদস্য আশু ঘোষ। আশু ঘোষের অঘটন ঘটাবার অসামান্য ক্ষমতার পরিণামে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলা কংগ্রেস থেকে তিনজন, জনসংঘ থেকে একজন এবং একজন নির্দল বিধায়ক কংগ্রেসে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে আশু ঘোষ কংগ্রেস নেতৃবর্গকে এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে যুক্তফ্রন্টের আরও চোদ্দ জন বিধায়ক কংগ্রেসে যোগ দিতে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন তা হল এই যে ২৬ জুলাই প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করবেন। অতঃপর পনেরো জন বিধায়ক যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবে, পরিণামে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটবে এবং ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত হবে নতুন মন্ত্রিসভা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পনেরো জন বিধায়ক যুক্তফ্রন্টের ক্যাডার বাহিনীর হাতে লাঞ্ছনার ভয়ে পিছিয়ে যান এবং ২৬ জুলাই প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগপত্র দাখিল করেও তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শেষ হয় এবং দল ভাঙিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার জন্য মরিয়া কংগ্রেস নেতৃবর্গ এবার দ্বারস্থ হন অজয় মুখোপাধ্যায়ের। বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্ট শাসনের কয়েক মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের আশাভঙ্গ হয়। খাদ্যমন্ত্রী সম্পর্কে সি পি আই(এম)-এর প্রচার তাঁকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সঙ্কটের জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করাও তিনি প্রফুল্ল ঘোষের মতো মানতে পারেন নি, এমন কি খাদ্যের দাবিতে সি পি আই (এম)-এর আগ্রহে যুক্তফ্রন্টের ডাকা ২৪ আগস্ট তারিখের হরতালেও তাঁর সায় ছিল না। অন্য দিকে ২ আগস্ট তারিখে মহাকরণে তাঁর ঘরের সামনে কোঅর্ডিনেশন কমিটির অর্ন্তভুক্ত সরকারি কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হন ভিন্ন সংগঠনের কিছু কর্মী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই গোলমাল থামাতে গিয়ে নিজেও অপমানিত ও মৃদু নিগৃহীত হন। অতঃপর তাঁর সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করে ও ক্যাবিনেটকে পাশ কাটিয়ে অর্থমন্ত্রী জ্যোতি বসু বেতন কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি গেজেটে ছাপতে পাঠালে তিনি খুবই আহত হন এবং গেজেট ছাপা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর বেতন কমিশন গঠন নিয়ে ক্যাবিনেটে ভোট গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে যে ভোট পড়ে তাতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে সি পি আই (এম) ও তার সহযোগীদের সঙ্গে অজয় মুখোপাধ্যায়ের বড় রকমের ব্যবধান দেখা দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ অজয় মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন এবং দিনের পর দিন গোপন বৈঠকের পর পরিকল্পনা পাকা হয়ে যায় যে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেবেন এবং নতুন সরকার গঠন করবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হয়ে যায় যে ২ অক্টোবর অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করবেন এবং তদনুযায়ী রাজ্যপাল, প্রশাসনের ওপর মহল এবং পুলিশ দপ্তর যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেন। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থীরা এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে বর্ষীয়ান ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসুর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলের জন্য অনুরোধ-উপরোধ করেন। কিন্তু অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। অথচ ২ অক্টোবর দুপুর নাগাদ তাঁকে এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায় এবং ঐ দিনই রাত্রি আটটা নাগাদ রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ধর্মবীরকে তিনি পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসেন। কেন অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগের ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন তার সঠিক কারণ আজও অজ্ঞাত।

দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ এবার শরণাপন্ন হন। বাংলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবিরের এবং ডঃ ঘোষকে পুরোভাগে রেখে নতুন সরকার গড়ার জন্য তাঁকে সবিশেষ অনুরোধ করেন। হুমায়ুন কবির সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায় দেন কারণ যদিও তিনিই ছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রকৃত রূপকার তথাপি সরকার গঠনের পর থেকে তিনি অজয় মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা উপেক্ষিত হতে থাকেন। এমন কি পদত্যাগের ব্যাপারে অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানান নি। ইতিমধ্যে সরকার গঠনের কিছু দিন পরেই বাংলা কংগ্রেসে অজয় মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠী ও কবির গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং ক্রান্তি দলে যোগদানের প্রশ্নে এই বিরোধ চরমে ওঠে। অন্যদিকে প্রফুল্ল ঘোষ ও রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই তিন পক্ষ মিলে আবার সরকার ভাঙার পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে বিধায়ক ভাঙিয়ে নিয়ে আসার কাজে অতীব পারদর্শী আশু ঘোষ যোগ দেন। ফলে ঘটনাপ্রবাহ এবার দ্রুতগতিতে এগোতে থাকে। অক্টোবরের মধ্যভাগে জাহাঙ্গির কবির প্রমুখ বাংলা কংগ্রেসের হুমায়ুন কবির গোষ্ঠীর নয় জন বিধায়ক বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে যুক্তফ্রন্টের কাছে স্বতন্ত্র দল হিসাবে

স্বীকৃতি দাবি করেন। ৩ নভেম্বর খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করেন এবং সেই সঙ্গে আরও আঠারো জন বিধায়ক যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এর ফলে দৃশ্যত যুক্তফ্রন্ট সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল ধর্মবীর লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন ডেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করার পরামর্শ দেন। এর জবাবে ৭ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে জানান যে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ ডিসেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হবে। এতে রাজ্যপাল আপত্তি জানান এবং পুনরায় বিধানসভার অধিবেশন আগে ডাকার পরামর্শ দেন। বিধানসভার অধিবেশন ডাকা নিয়ে এইভাবে কয়েকদিন টানাপোড়েন চলার পরে রাজ্যপাল ধর্মবীর কোনও রকম পূর্বাভাস না দিয়ে হঠাৎ ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত অজয় মুখোপাধ্যায়কে চিঠি মারফত জানান যে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি নয় মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছেন। প্রায় একই সময়ে সদ্য গঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (P.D.F) -এর নেতা হিসাবে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর দুজন সহযোগী যথাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন রাজ্যপালের কাছে। অতঃপর রাজ্যপাল নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করার নির্দেশ দেন। প্রথম দুমাস নতুন সরকারকে সমর্থন জানানোর পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কংগ্রেস এই মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়।

রাজ্যপাল ধর্মবীর কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার ঘটনা ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা হিসাবে আজও বিবেচিত হয়ে থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বীকৃত নিয়ম এই যে সাংবিধানিক প্রধান আইনসভার অধিবেশন ডাকার আনুষ্ঠানিক অধিকারী হলেও এ বিষয়ে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য। তদনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার তারিখ স্থির করার ক্ষমতা দেয় নি। তিনি এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে পারেন বা অনুরোধ জানাতে পারেন। কিন্তু এই পরামর্শ মেনে চলা বা অনুরোধ রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে মুখ্যমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার ইচ্ছাধীন অতএব বিধানসভার অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে রাজ্যপালের নির্দেশিত তারিখ না মেনে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় কোনও অন্যায় করেন নি বা সংবিধান লঙ্ঘন করেন নি এবং এই অজুহাত দেখিয়ে কোনও নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধান অবশ্যই রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দিয়েছে এবং এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে দায়বদ্ধ একমাত্র আইনসভার নিম্নকক্ষের কাছে। অর্থাৎ,মন্ত্রিসভাকে অপসারণের অধিকার একমাত্র আইনসভার নিম্নকক্ষের, অন্য কারুর নয়, এমন কি সাংবিধানিক প্রধানেরও এ অধিকার নেই। অতএব ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রাজ্যস্তরে একটি নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করার কোনও অধিকার রাজ্যপালের নেই। রাজ্যপাল ধর্মবীর যা করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ, অসাংবিধানিক ও অনৈতিক এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীন পি ডি এফ মন্ত্রিসভা ছিল অবৈধ।

অতঃপর প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভার পরামর্শে ২৯ নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশন প্রসঙ্গে যে রুলিং দেন তা-ও এক ইতিহাস হয়ে আছে। অধ্যক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধ সরকারের ডাকা বিধানসভার অধিবেশনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য

মুলতুবি করে দেন। অধ্যক্ষের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ সম্পর্কে আতঙ্কিত পি ডি এফ সরকার রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়ে অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুলিং পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারে ও কংগ্রেস দলে সংবিধানসম্মত এক উপায়ের খোঁজ চলতে থাকে। অন্য দিকে যুক্তফ্রন্টের বিধায়ক ভাঙিয়ে পি ডি এফ মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে যাঁর ছিল মুখ্য ভূমিকা সেই কংগ্রেস এম এল সি আশু ঘোষের সঙ্গে নতুন সরকার গঠনের পর শাসক দল ও কংগ্রেস উভয় পক্ষেরই সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল এই যে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পি ডি এফ ও কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন এবং আশু ঘোষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই নিজেদের মধ্যে কালনেমির লঙ্কাভাগে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই সক্রিয়তার পরিণতি হিসাবে ৪ ডিসেম্বর ৮ জন পি ডি এফ সদস্য মন্ত্রী হন এবং আশু ঘোষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ১৪ জানুয়ারি কংগ্রেস নেতৃবর্গ নতুন সরকারের মন্ত্রিপদের জন্য রাজ্যপালের কাছে ছজন কংগ্রেস বিধায়কের নাম পাঠিয়ে দেন যাঁরা পর দিন রাজ্যপালের কাছে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। এই সব ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ আশু ঘোষ ঘোষণা করে দেন যে ৩২ জন বিধায়কসহ তিনি প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। অতঃপর শ্রী ঘোষ শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রেখে ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট(INDF) নামে একটি নতুন দল গঠন করেন এবং যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ও শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ডাকা হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে স্পিকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুলিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিবেশন ছিল অবৈধ এবং এই কারণে এই অধিবেশন তাঁরা কিছুতেই হতে দেবেন না। তাই বিধানসভায় রাজ্যপালের প্রবেশপথ যুক্তফ্রন্ট বিধায়কেরা অবরোধ করেন এবং রাজ্যপাল ভিন্ন পথ দিয়ে কোনও ভাবে সভাকক্ষে ঢুকে উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলে তাঁকে ভীষণভাবে বাধা দেওয়া হয়। অতঃপর রাজ্যপাল কোনও মতে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলে বিধানসভা ভবন বিশৃঙ্খল এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ডঃ ঘোষের ওপর শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। অতঃপর কেন্দ্র এই সিদ্ধান্তে আসে যে পশ্চিমবঙ্গে পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব নয় যেহেতু স্পিকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া রুলিং থেকে যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনও রাস্তা নেই। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নির্দেশে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীন পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার পদত্যাগ করে ২০ ফেব্রুয়ারি এবং পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম শুরু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনের পর মাত্র এক বছরের মধ্যে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যেগুলির প্রত্যেকটিই বাঙালি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমত, এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম অকংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম শুরু হয় কোয়ালিশন সরকার। তৃতীয়ত, এই পর্বে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করার এক নজিরবিহীন ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। চতুর্থত, স্পিকারের রুলিংয়ের পরিণামে একটি সরকারের পতন শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতার আলোকেই ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঘটনাও ঘটে এই পর্বে।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের যাত্রা শুরু

যুক্তফ্রন্ট সরকারের নয় মাসের শাসন এবং পরবর্তী পি ডি এফ মন্ত্রিসভার তিন মাসের শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয় ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এবং এই রাষ্ট্রপতি শাসন চলে ঠিক এক বছর। .এই এক বছর ছিল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের প্রবল সক্রিয়তা আর কংগ্রেসের চরম নিষ্ক্রিয়তার পর্ব। রাজ্যপাল ধর্মবীর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে অসাংবিধানিক ও অন্যায় কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু এক অর্থে তিনি যুক্তফ্রন্টের বড় এক উপকার করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬৭-এর নির্বাচনে রাজ্যের বাম দলগুলি একজোট হতে পারে নি এবং নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে বাধ্য করলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য তখনও আসেনি। কিন্তু তারা নিজেরা যা পারেনি তা-ই সম্ভব হয় রাজ্যপালের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপে। রাজ্যপাল ধর্মবীর সরকার বরখাস্ত করে বাম দলগুলির ওপর যে আঘাত হানেন তার প্রভাবে এক স্বতঃস্ফূর্ত বাম ঐক্য দেখা দেয় পশ্চিমবঙ্গে এবং ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই ঐক্য অটুট থাকে। আবার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রাজ্যপালের অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী জোতদার শ্রেণী ছাড়া অন্য কেউই মেনে নিতে পারেনি। স্বভাবতই রাষ্ট্রপতি শাসনকালে যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে জনসমর্থন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান এই জনসমর্থনে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্টের 'শরিকরা, বিশেষত সি পি আই ও সি পি আই(এম) পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ভাবে খুবই তৎপর হয়ে ওঠে।

১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর রাজ্যপাল ধর্মবীর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। পরদিন থেকেই সর্বস্তরে শুরু হয় আন্দোলন এবং যতদিন পি ডি এফ সরকার শাসনক্ষমতায় থাকে ততদিন এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পি ডি এফ সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হলে বামপন্থীদের উদ্যোগে এই আন্দোলন বহুধাবিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ও বেসরকারি অফিসকর্মীদের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। অবশ্য এইসব আন্দোলন ছিল মূলত শহরভিত্তিক। গ্রামাঞ্চল ছিল তুলনামূলকভাবে শান্ত। কারণ গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীদের সংগঠন তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্যপাল যে ঠিক কাজ করেন নি এমন একটা ধারণা তখন গ্রামের মানুষের মনেও দেখা দিয়েছে, এমন কি গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষও তখন গরীবের বন্ধু যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হতেশুরু করেছেন। এতদ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে ধর্মবীর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করায় যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক জন-সহানুভূতি পেয়ে রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট লাভবানই হয়। তথাপি যুক্তফ্রন্ট আত্ম-সন্তুষ্টিতে আক্রান্ত হয়নি। রাষ্ট্রপতি শাসনের এক বছরে নানা ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে সি পি আই(এম) ও অন্যান্য শরিকরা পরিকল্পিতভাবে যুক্তফ্রন্টের সপক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালায়। ফলে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় তখন যুক্তফ্রন্টের জয়ের ক্ষেত্র প্রায় প্রস্তুত।

অন্যদিকে এই এক বছরে রাজ্য কংগ্রেস কার্যত প্রায় চুপ করেই বসেছিল, অর্থাৎ, তার পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কোনও উদ্যোগ ছিল না, ছিল না কোনও সুপরিকল্পিত প্রচারাভিযান। কংগ্রেসের এই অক্ষমতার পিছনে অবশ্য কারণও ছিল যথেষ্ট। প্রথমত, জনসাধারণের সামনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরার কোনও সুযোগ কংগ্রেসের সামনে ছিল না, কারণ যে সরকার মাত্র নয় মাস কর্মরত ছিল কোনওভাবেই তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের সমর্থনে পি ডি এফ মন্ত্রিসভা গঠনের পিছনে এমন কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল না যা জনসাধারণকে বিশ্বাস করানো যায়। বস্তুত, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙার জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণের চোখে কংগ্রেস দোষী হয়েই ছিল এবং এই দোষ স্খালনের কোনও উপায়ই তার জানা ছিল না। তৃতীয়ত, বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন সরকারের মতো প্রফুল্ল সেনের সরকার যদি দক্ষতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় রাখত তাহলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের উজ্জ্বল নজির দেখিয়ে কংগ্রেস তখন জনসমর্থন সংগ্রহে তৎপর হতে পারত। কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রফুল্ল সেনের সরকার ছিল নিতান্তই সাদামাটা। বাঙালি জীবনে গতিশীলতা আনতে এই সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। চতুর্থত, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়ে এবং নটি রাজ্যে শাসনক্ষমতা হারিয়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস তখন যথেষ্ট দুর্বল। ফলত সর্বোচ্চ নেত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি যথেষ্ট অনুজ্জ্বল এবং তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও তখনও শুরু হয়নি। পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর নাম ভাঙিয়ে ইতিবাচক কোনও প্রচারাভিযান চালানো রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে এমন দুটি ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন। প্রথমত, সি পি আই (এম) প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী সংগঠন নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেয় যে তারা যুক্তফ্রন্টের এক বড় সমর্থক এবং অতঃপর নির্বাচনের সময় আনুষ্ঠানিক কাজে সক্রিয় ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য তারা অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ জিনিস অতীতে পশ্চিমবঙ্গে কখনও দেখা যায় নি এবং, বলা বাহুল্য, পৃথিবীর পরিণত সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এ জিনিস অকল্পনীয়। নির্বাচনের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে পক্ষপাতসম্পন্ন সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সদস্যরা ব্যাপক হারে নির্বাচন পরিচালনার কাজে অংশ নেওয়ার ফলে নির্বাচনের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা আজ সম্ভব নয় কারণ এ ব্যাপারে কোনও তথ্য নেই এবং উল্লেখ্য যে এই নির্বাচনের পর সে দিন বেশ কিছু সরকারি অফিসার অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও কোনও সংবাদপত্রই সেদিন নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেনি। তবে বাঙালি ইতিহাসের দলিল রক্ষার স্বার্থে একথা বলা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯-এর বিধানসভা নির্বাচনেই সর্বপ্রথম এই প্রবণতা দেখা যায় যা আজও অব্যাহত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও একদল ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবণতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ জিনিস খুবই অবাঞ্ছনীয়। কারণ উদারনীতিবাদী গণতন্ত্র মুক্ত ও অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার আদর্শে বিশ্বাসী এবং সরকারি শাসনযন্ত্রের অংশ হয়েও যদি কেউ নির্বাচনে

অংশগ্রহণকারী কোনও বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাত দেখান এবং সরকারি কর্তব্য পালনে এই পক্ষপাত বজায় রাখেন তাহলে এই আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়।

সি পি আই(এম)-এর অনুগত সরকারি কর্মচারী সংগঠন এই আদর্শের পরোয়া করেনি কারণ সি পি আই (এম)-এর পক্ষ থেকে সে সময় তার সমস্ত শাখা সংগঠন তথা জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে সংসদীয় পথে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে উৎখাত করে বাম শক্তির শাসনক্ষমতায় আসাটাই এক সার্থক বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার ''সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও হবে কার্যত এক সমাজতান্ত্রিক সরকার। তাত্ত্বিক বিচারে এই ধারণা যে ছিল এক হিমালয় সদৃশ ভুল সি পি আই (এম) নেতৃবর্গ তা অবশ্যই জানতেন। তথাপি সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে, অর্থাৎ,ভোটের স্বার্থে তাঁরা এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) থেকে বেরিয়ে আসা নকশালপন্থীরা যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং দেখা যায় যে সি পি আই (এম) প্রচারিত এই ভ্রান্ত বিপ্লবী ধারণা খণ্ডনে তাঁরা অত্যন্ত তৎপর যেহেতু তাঁরা বিশ্বাসী সশস্ত্র বিপ্লবে। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত এবং গোড়ার দিকে যে আন্দোলনের প্রতি সি পি আই (এম)-এর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল তিন মাসের মধ্যে সি পি আই(এম)-এর সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ায় এবং চীনের উল্লসিত পিপলস ডেইলি তাকে 'ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' আখ্যা দিয়ে অভিনন্দিত করে। পরবর্তী এক বছরে চারু মজুমদারের তাত্ত্বিক প্রেরণায় নকশালপন্থীদের কৃষক আন্দোলন অনেক বেশি সংগঠিত হয়। অতঃপর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার নীতিকে রূপায়িত করার স্বপ্ন নিয়ে নকশালপন্থী ছাত্ররা ঘাঁটি গাড়েন মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে এবং তাঁদের জীবনচর্যা, নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে সত্যাসত্য মেশানো যে সব খবর ছড়াতে থাকে তাতে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মনেই এক ধরনের শ্রদ্ধা, ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত কল্পধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯-এর নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিতে থাকেন চারু মজুমদার ও তাঁর অনুগামীরা। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে কেউ কখনও নির্বাচন বয়কটের ডাক দেননি। কাজেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে এ-ও ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবশ্য চারু মজুমদারের নির্বাচন বয়কটের ডাকে সাড়া দেননি। ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নির্বাচন পর্ব শেষ হলে দেখা যায় যে ভোট দানের হার খুবই ভাল। ১৯৬৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬২.০৮ শতাংশ, এবার ভোটদানের হার ৭০ শতাংশ। ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে মোট ২৮০ আসনের মধ্যে ২১৮ টি আসন পেয়েছে যুক্তফ্রন্ট আর কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৫৫ টি আসন, অর্থাৎ, তিন চতুর্থাংশের বেশি আসন দখল করে যুক্তফ্রন্ট আর ১৯৬৭ এর নির্বাচনে যে কংগ্রেস ১২৭ টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল সেই কংগ্রেস পায় মাত্র ১৯.৬৪ শতাংশ আসন। নিঃসন্দেহে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এ ছিল এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় অংশীদার ছিল সি পি আই(এম) এবং তুলনামূলক বিচারে তার অগ্রগতিও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্তফ্রন্টের সব প্রধান শরিকই (বাংলা কংগ্রেস ছাড়া, বাংলা কংগ্রেস একটি আসন কম

পেয়েছিল) ১৯৬৭-র তুলনায় ১৯৬৯-এর নির্বাচনে আসন সংখ্যা বাড়াতে পেরেছিল। তবে সিপি আই(এম)-এর আসন বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৬৭ -র নির্বাচনে এই দল পেয়েছিল ৪৩টি আসন, ১৯৬৯ এর নির্বাচনে তিনজন সমর্থিত নির্দল সহ তার আসন সংখ্যা হয় ৮৩, অর্থাৎ তার আসন সংখ্যা ৯৩ শতাংশ বেড়ে যায় এবং যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকের মধ্যে সে-ই হয় বৃহত্তম দল।

১৯৬৯-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল সাফল্যের পিছনে মূল কারণ ছিল অকংগ্রেসিদের অটুট জোটবদ্ধতা, অর্থাৎ, এই নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট ভাগ হয় নি। অন্যদিকে আসনসংখ্যার বিচারে এই নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছিল বটে, কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে পশ্চিমবঙ্গবাসী একযোগে কংগ্রেসকে বর্জন করেছিল। কারণ, প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল ৪৯.০৯ শতাংশ ভোট আর কংগ্রেস পেয়েছিল ৪০.০৪ শতাংশ। সংখ্যার হিসাবে দুই পক্ষের মধ্যে মাত্র ১৩ লক্ষ ভোটের ব্যবধান ছিল। এর অর্থ এই যে ১৯৬৭-এর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা মহানগরী ও শহরাঞ্চলে কংগ্রেস বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠলেও তার ঢেউ গ্রামের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের অনুকূলে সমর্থনের যে পোক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট তখনও তা ভাঙতে পারেনি। সঙ্গত কারণেই তাই ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হলে গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরাঞ্চলের, বিশেষত, কলকাতা মহানগরীর মানুষ আনন্দে-উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে ওঠেন। বাইরে যখন এই আনন্দের কল্লোল তখন যুক্তফ্রন্টের অন্দরমহলে কিন্তু শুরু হয়েছে বিতর্ক যে কারণে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সাত দিন ধরে সরকার গঠনের ব্যাপারে চরম অনিশ্চয়তা চলতে থাকে। এই বিতর্কের সূত্রপাত করে সি পি আই(এম)। নির্বাচনী ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই (এম) দাবি পেশ করে যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সহ মুখ্যমন্ত্রীর পদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রিপদ তাকেই দিতে হবে যেহেতু যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তাকে বৃহত্তম দলের স্বীকৃতি দিয়ে জনগণ এই নির্দেশই দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস এবং অন্যান্য প্রধান শরিকদের বক্তব্য ছিল এই যে অন্যায়ভাবে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই জনগণ যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছে। অতএব কোনও পরিবর্তন না করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আদলেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া উচিত। পাঁচ দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন চলার পর অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারি রাত্রে এ ব্যাপারে মীমাংসা হয় এই যে, অজয় মুখোপাধ্যায়ই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তাঁর হাতে থাকবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের শুধু রাজনৈতিক বিভাগ আর জ্যোতি বসু হবেন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর হাতে থাকবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ দপ্তর। অন্যান্য শরিকদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করতে গিয়েও ১৯৬৭-র মন্ত্রিসভা থেকে কিছু পরিবর্তন করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় এস ইউ সি আই নেতা সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। ১৯৬৭ তে তিনি ছিলেন শ্রমমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রী হিসাবেই তিনি প্রবর্তন করেছিলেন ঘেরাও নীতি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে তাঁকে করা হয় পূর্তমন্ত্রী এবং এইভাবে পরোক্ষভাবে খারিজ করা হয় তাঁর ঘেরাও নীতি।

অতঃপর বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি শপথ নিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জীবনে দেখা দিল অভাবনীয় দুর্যোগ। বস্তুতপক্ষে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ও কর্মপদ্ধতি কী হবে, এই সরকারের কার্যকালে পুলিশ ও প্রশাসন কীভাবে চলবে তার আভাস পাওয়া গেল মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পক্ষকাল পরেই। ১৯৬৯ সালের ১৩ মার্চ দুপুর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নকশালপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ চলতে থাকে। অতঃপর

বিকেলে হেয়ার স্কুলের পিছন দিকে প্যারী সরকার স্ট্রীটে কৃষ্ণদাস রায় নামে একজন যুবক(সি পি আই এম এর পক্ষ থেকে সে সময় তাঁকে ছাত্র বলে অভিহিত করে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল। আজ অবশ্য সকলে তাঁকে যুবকর্মী হিসাবে স্বীকার করেন) বোমার আঘাতে নিহত হন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজের ইডেন হিন্দু হস্টেলের নকশালপন্থী আবাসিকদের সমুচিত শিক্ষা দিতে যুক্তফ্রন্টের এক সশস্ত্র বাহিনী হস্টেলের সদর দরজা ভেঙে হস্টেলের ভেতরে ঢোকে এবং নির্বিচারে সকলকে পেটাতে থাকে। তাদের পীড়ন থেকে ছাত্রাবাসের অধীক্ষক ও সহ-অধীক্ষকও অব্যাহতি পাননি। সেই রাত্রে কলেজ অধ্যক্ষ ও ছাত্রাবাসের অধীক্ষকদের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করা হয়নি। পরদিন দুপুরে কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণদাস রায়ের হত্যাকাণ্ডে নিন্দা ও ধিক্কার জানাতে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন মন্ত্রী জনসভা করেন এবং একজন মন্ত্রী মন্তব্য করেন যে উগ্রপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজনে জনগণের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়া হবে। বোধ করি, তাঁর মন্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংগঠিত এক বাহিনী জনসভা শেষ হওয়ার পরেই ইডেন হিন্দু হস্টেল ঢুকে আবার তাণ্ডব চালায়। এমতাবস্থাতেও হস্টেল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য পাননি এবং সন্ত্রস্ত সংবাদপত্রগুলি এই দুদিনের ঘটনার কোনও বিবরণই ছাপায়নি। অবশেষে সপ্তাহ খানেক পরে যখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত তখন পুলি পিকেট বসে ইডেন হিন্দু হস্টেলের গেটে। লক্ষণীয় যে উপমুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ সম্পর্কে বিধানসভায় যে লিখিত বিবৃতি দেন তাতে ইডেন হিন্দু হস্টেলে দুই দিনের তাণ্ডবের কোনও উল্লেখ ছিল না, কৃষ্ণদাস রায়ের বোমার আঘাতে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেই বিবৃতিটি শেষ হয়। বামপন্থীদের পরিচালিত জনগণের সরকারের পক্ষ থেকে সত্যকে প্রয়োজনমতো কাটছাঁট করার সূত্রপাত হয় এইভাবে।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বও পতন

ক্ষমতায় এসেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্বাগ্রে রাজ্যপাল ধর্মবীরের অপসারণের দাবি জানায় কেন্দ্রের কাছে। নির্বাচনের পর নতুন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল ৬ মার্চ। ২ মার্চ রাজ্য মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে টেলিগ্রাম মারফত৬ মার্চের আগেই রাজ্যপালকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে রাজ্য সরকারের এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের দেয় ভাষণের যে খসড়া মন্ত্রিসভা প্রস্তুত করে তাতে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার জন্য রাজ্যপাল ধর্মবীর সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। ৫ মার্চ রাজ্যপাল ধর্মবীর মন্ত্রিসভাকে জানিয়ে দেন যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত পুরো ভাষণ তাঁর পক্ষে বিধানসভায় পড়া সম্ভব নয় এবং কোন কোন অংশ পড়তে তিনি অক্ষম তা-ও তিনি চিহ্নিত করে দেন। অতঃপর ৬ মার্চ বিধানসভায় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু পড়েন এবং মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ চলাকালীন উঠে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। এর তিন সপ্তাহের মধ্যেই অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মবীরকে সরিয়ে নেয়। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধের একটা সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে এই বিরোধের আর এক ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়। যুক্তফ্রন্টের ৩২-দফা কর্মসূচির সর্বশেষ দফায় ছিল রাজ্য বিধানপরিষদ বিলোপের প্রতিশ্রুতি। নবগঠিত বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরেই মূলত সি পি আই(এম)-এর আগ্রহাতিশয্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিধানসভায় বিধানপরিষদ বিলোপের বিল পাশ করিয়ে নেয়। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদে কংগ্রেস ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কাজেই বিধানপরিষদ বিলোপের ব্যাপারে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের আপত্তি থাকাই ছিল স্বাভাবিক এবং কেন্দ্র এই বিলোপ সম্পর্কিত বিল পাশ না করলে রাজ্য সরকার নিঃসন্দেহে এটিকে ইস্যু করে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদ বিলোপের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও রাজ্য কংগ্রেস এদের কারুরই কোনও আপত্তি নেই। ফলত, কোনও বিরোধ ছাড়াই অবলুপ্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ। অবশ্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি জানিয়েছে সি পি আই (এম)। ৯ মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় সমাবেশে পার্টির পক্ষ থেকে জ্যোতি বসু দাবি জানান যে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা আর অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন ছাড়া বাকি সব বিষয়ে ক্ষমতা দিতে হবে রাজ্যের হাতে।

এছাড়া দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যে সি পি আই(এম) নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র- কাঠামোর মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা নিতান্তই সীমিত যে কারণে এই সরকারের পক্ষে কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অতএব রাজ্যস্তরে এই সীমিত ক্ষমতা লাভ তাঁদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের লক্ষ্য হল যুক্তফ্রন্ট সরকার যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাকে কাজে লাগিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা এবং এই উদ্দেশ্যে খেত-খামারে, কলকারখানায় ও অন্যত্র শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা। এর আগেই কিন্তু কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন নকশালপন্থীরা এবং তাঁদের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে চারু মজুমদারের তত্ত্ব যে এই বিপ্লবকে

সফল করার পূর্ব শর্ত হল রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংস সাধন যে জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রামের আর এই সংগ্রামের স্বার্থে জরুরি কাজ হল বন্দুক সংগ্রহ অভিযান। সি পি আই(এম)-এর চোখে এ বিপ্লব নয়, এ হল বিপ্লবের নামে হঠকারিতা যা বিষয়গত অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিপ্লবের প্রয়াসকে নিরর্থক করে তোলে। এই হঠকারিতার প্রতিরোধকে সি পি আই(এম) স্বভাবতই তার অন্যতম বিপ্লবী কর্তব্য বলে গণ্য করে। বোধকরি, এই কর্তব্য পালনের জন্যই মন্ত্রিসভা গঠনের আঠারো দিন পরে ইডেন হিন্দু হস্টেলের নকশালপন্থীদের শায়েস্তা করতে সি পি আই(এম) অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং তার কিছুদিন পরে ১৯৬৯ সালের ১ মে তারিখে মনুমেন্টের পাদদেশে নকশালপন্থীদের আয়োজিত এক সমাবেশে সি পি আই (এম এল) পার্টির আনুষ্ঠানিক জন্ম ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরে চৌরঙ্গি অঞ্চলে সি পি আই(এম)-এর মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে নকশালপন্থীদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। ইতিমধ্যে ১১মে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা পুরসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৭১টি আসন পেয়ে কলকাতা পুরসভা প্রথম দখল করে। কংগ্রেস পায় ২২ টি আসন আর জনসংঘ ২টি।

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মাসের পর মাস ধরে চলতে থাকে চরম সন্ত্রাস আর বিশৃঙ্খলা। একদিকে নকশালপন্থীরা গ্রামে গ্রামে শুরু করেন তাঁদের শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি যার ফলে নির্বিচারে চলতে থাকে ব্যক্তিহত্যা। অন্যদিকে সি পি আই(এম)-এর অধীনস্থ কৃষক সমিতির উদ্যোগে জঙ্গী সশস্ত্র বাহিনী গ্রামে গ্রামে বল প্রয়োগ করে বেনামী জমি উদ্ধারের নামে জমি দখল করতে শুরু করে। সি পি আই(এম)-এর চোখে এ ছিল এক সার্থক বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলন এবং এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে পুলিস, প্রশাসন যাতে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ না করে তা সুনিশ্চিত করা এক মহান কর্তব্য বলে মনে করতে থাকেন সি পি আই(এম)-এর মন্ত্রিবর্গ। সি পি আই (এম)-এর এই কৃষক আন্দোলন যদি বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হত তাহলে এর বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে অবশ্যই সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকত না। কিন্তু সি পি আই(এম)-এর এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এমন সময়ে যখন প্রশাসন ও পুলিশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বা নিষ্ক্রিয় রাখার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল এই দলের হাতে এবং এই জন্যই এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেই সে সময় সন্দিহান ছিলেন।

বস্তুত, রাজনৈতিক মহলে অনেকেই সে দিন বুঝেছিলেন যে এই আন্দোলনের পিছনে ছিল প্রধানত দুটি কারণ। প্রথমত, নকশালপন্থীরা সি পি আই(এম)-এর মেকি বিপ্লবীয়ানা সম্পর্কে ছিল অতি মাত্রায় সোচ্চার। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে সংসদীয় রাজনীতির মোহে আচ্ছন্ন সি পি আই(এম) তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে সংশোধনবাদে লিপ্ত হয়েছে। নকশালপন্থীদের এই অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য সি পি আই (এম)-এর পক্ষ থেকে জঙ্গী কোনও আন্দোলন সংগঠিত করাটা ছিল খুবই জরুরি। দ্বিতীয়ত,১৯৬৭ সালের ও ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের পর যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের শরিক হয়ে সি পি আই(এম)-ই একমাত্র বামপন্থী দল যে বাস্তব পরিস্থিতি সবচেয়ে ভাল বুঝে নেয়। রাজ্য স্তরের দলীয় নেতৃবর্গ বুঝতে পারেন যে ১৯৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হলেও এবং ১৯৬৯-এ তার ভরাডুবি হলেও গ্রামে বামপন্থীদের কোনও শক্ত ঘাঁটি তৈরি হয় নি এবং যা গড়ে না উঠলে বাম রাজনীতির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সাফল্য অনিশ্চিত। সম্ভবত, তাঁরা আরও মনে করেন যে বামপন্থী রাজনীতির প্রধান চালক হিসাবে এই ঘাঁটি তৈরি করার গুরু দায়িত্ব একমাত্র সি পি আই (এম)-এর এবং এইজন্যই ১৯৬৯ সালে ক্ষমতায় এসে কৃষক আন্দোলনের পথ ধরে তাঁরা দলের অনুকূলে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে পড়েন। এ ছাড়া ১৯৬৭ সালে সরকারি ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে সি পি আই (এম) বুঝতে পারে

যে প্রশাসন ও পুলিশের ওপর কর্তৃত্ব থাকলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন কত সহজ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৬৯ সালে প্রশাসন ও পুলিশকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পেরে এই দল দ্রুতগতিতে গ্রামাঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠে।

সি পি আই (এম)-এর এই ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়ানোর রাজনীতির স্বরূপ অনতিকালের মধ্যেই বুঝতে পারে যুক্তফ্রন্টের অন্যন্য বাম-শরিকরা। স্বভাবতই তারাও এবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার তিন মাসের মধ্যে জমি দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে শুরু হয় শরিকি সংঘর্ষ যা চলতে চলতে অবশেষে ছড়িয়ে পড়ে শহরাঞ্চলেও। এই শরিকি সংঘর্ষের পরিণামে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সি পি আই ও সি পি আই(এম) এই দুই কমিউনিস্ট পার্টির পারস্পরিক সম্পর্ক। ইতিমধ্যে ১৯৬৯-এর মধ্যভাগে দেখা দেয় ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে কংগ্রেসের ভাঙন এবং তার অব্যবহিত পরেই ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপ বিলের মাধ্যমে নিজের প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল নীতির অজুহাত দেখিয়ে সি পি আই ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছাকাছি আসতে থাকে। এতে সি পি আই ও সিপি আই(এম)-এর মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়ে। অবশেষে অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি পি আই কেরলে নাম্বুদিরিপাদ মন্ত্রিসভার পতন ঘটালে দুই কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে চরম তিক্ততা দেখা দেয়।

একদিকে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে এই অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ এবং অন্যদিকে নকশালপন্থীদের তথাকথিত শ্রেণীশত্রু নিধন যজ্ঞ— এই দুইয়ে মিলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের আট মাসের মধ্যেই রাজ্য জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা আর অস্থিরতা দেখা দেয়। এই দুর্ভাগ্যজনক গৃহযুদ্ধ যখন ক্রমবর্ধমান তখন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর পদাধিকারী হয়েও ক্ষমতাহীন এক নিতান্ত অসহায় দর্শক। যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক সি পি আই (এম) সরকারকে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করার ফলে এই সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কাজে উদ্যোগী করার শক্তি তাঁর ছিল না, অর্থাৎ, সরকারের সর্বোচ্চ নেতা হয়েও সরকারকে গড়ার কাজে মনোনিবেশ করানোর মতো কর্তৃত্ব তাঁর ছিল না। অন্যদিকে পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি সত্ত্বেও সরকারের প্রধান হিসাবে কঠোর শাসনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়াও ছিল তাঁর সাধ্যের বাইরে। এক কথায় তিনি ছিলেন ঠুটো জগন্নাথ মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের প্রধান হিসাবে যাবতীয় কাণ্ডকারখানার জন্য কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁর, কিন্তু এই কাণ্ডকারখানা তাঁর হুকুমে চলত না, চলত উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হুকুমে। শ্রী বসু ও তাঁর দল এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই গাজোল থানার ও সি-কে বদলি করার ব্যাপারে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অবজ্ঞা করার মতো সাহস দেখান এবং এ বিষয়ে নিজের সঠিক অবস্থান প্রমাণার্থে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিঠি চালাচালি করেন।

নিজের ক্ষমতাহীনতায় নাজেহাল ও ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় অবশেষে এমন এক ঘটনা ঘটান সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে যার কোনও নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেরই নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে তিনি অসভ্য ও বর্বর সরকার হিসাবে অভিহিত করেন এবং অতঃপর রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমবর্ধমান অবনতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কলকাতার কার্জন পার্কে ১৯৬৯ সালের ১ ডিসেম্বর অবস্থান ও অনশন শুরু করেন যা চলে কয়েকদিন ধরে। অজয় মুখোপাধ্যায় অবশ্যই জানতেন যে এই অবস্থান ও অনশনের ফলে সি পি আই (এম) সংযত হবে না এবং শরিকি সংঘর্ষও

বন্ধ হবে না। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসের রূপকার হিসাবে সিপি আই (এম)-কে অফিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। কিন্তু বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সবচেয়ে আগে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানায় যে শ্রেণী সেই শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন সন্ত্রস্ত ও নিশ্চুপ। একদিকে সি পি আই (এম) প্রভাবিত কর্মী সংগঠন ও জঙ্গী ক্যাডার বাহিনীর দাপটে সে ভীত। অন্যদিকে ইতিমধ্যে নকশাল আন্দোলন স্থানান্তরিত হয়েছে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে এবং কৃষি বিপ্লবের স্বপ্ন মুলতুবি রেখে তখন কলকাতা নগরী ও বিভিন্ন শহরে শুরু হয়েছে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জনের নামে মূর্তি ভাঙা এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরন্তর গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা। একই সঙ্গে নগরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে নকশাল পন্থীদের খতমের রাজনীতি। তাঁদের নেতা চারু মজুমদার সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভীত, বিভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ প্রতিবাদহীন।

এমন একটা অবস্থায় যে সরকার নিজেই অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ তার পক্ষে শাসনকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বস্তুতপক্ষে, ডিসেম্বর মাসে অজয় মুখোপাধ্যায় যখন কার্জন পার্কে অনশনে বসেন তখনই রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকবে না। অতএব ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় যখন তাঁর বেতার ভাষণে রাজ্যবাসীকে তাঁর পদত্যাগ করার খবর জানান তখন কেউই বিস্মিত হননি এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর রাজ্য জুড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল এবার জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোনও ক্ষোভ দেখা যায় নি, কারণ তাঁদের কাছে এ ছিল এক অনিবার্য ঘটনা। তবে মন্ত্রিসভার পদত্যাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে সি পি আই (এম)। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পরদিনই অর্থাৎ ১৭ মার্চ এই দল ও তার শাখা সংগঠনগুলি চব্বিশ ঘন্টার বন্ধ ডাকে। এই বন্ধ উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটে। তবে ১৭ মার্চ সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে বর্ধমান শহরে। বন্ধের দিন সি পি আই (এম)-এর এক বিশাল মিছিলের দ্বারা আক্রান্ত হয় বর্ধমান শহরে কংগ্রেস সমর্থক মলয় সাঁইয়ের বাড়ি এবং ঘটনাস্থলে নৃশংসভাবে খুন হন মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই ও যতীন রায় নামে তিন ব্যক্তি। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সি পি আই (এম)-এর পক্ষ থেকে মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁইকে বর্ধমানের কুখ্যাত সমাজবিরোধী বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এই তথ্য যদি সত্যও হয়ে থাকে তাহলেও যেভাবে জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে তাঁদের নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল এই তথ্য তা সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। স্বভাবতই রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এতে ক্ষুব্ধ হন এবং বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান্য বামদলগুলির প্রায় সকলেই একযোগে সি পি আই (এম) কে এ জন্য ধিক্কার জানায়।

ইতিমধ্যে অজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তম দল হিসাবে সি পি আই(এম) রাজ্যপাল ধাওয়ানের কাছে সরকার গঠনের দাবি পেশ করে। রাজ্যপাল সি পি আই(এম) নেতৃবর্গকে তাঁর কাছে এই দলের অনুকূলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের প্রমাণ দাখিল করতে বলেন। অন্যদিকে সি পি আই(এম) নেতৃবর্গ তাঁকে জানিয়ে দেন যে সরকার গঠনের পর বিধানসভার অধিবেশনে তাঁরা উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেবেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এইভাবে টানাপোড়েন চলাকালীন বাংলা কংগ্রেস এবং প্রধান বামদলগুলি রাজ্যপালকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেয় যে সি পি আই (এম) সরকার গঠন করলে তারা সমর্থন করবে না। এমতাবস্থায় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত তাঁর রিপোর্টে জানিয়ে

দেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনওভাবেই সরকার গঠন সম্ভব নয় এবং ১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয় ।

এই রাষ্ট্রপতি শাসন চলে ঠিক এক বছর। এই কালপর্বে শহরাঞ্চলে নকশালপন্থীদের তাণ্ডবে এক অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। শ্রেণীশত্রু নিধনের নামে নকশালপন্থীরা সর্বপ্রথম তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেন সি পি আই(এম)-কে। পাড়ায় পাড়ায় যখন-তখন প্রকাশ্যে বোমা আর পাইপগান নিয়ে লড়াই চলতে থাকে সি পি আই(এম) কর্মীদের সঙ্গে নকশালদের। সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সি পি আই (এম) কর্মীরা ক্রমশ পিছু হটতে থাকেন এবং ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে অবশেষে প্রাণ রক্ষার তাগিদে তাঁরা নিজেদের এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে থাকেন। সি পি আই (এম) ক্যাডারদের এইভাবে উৎখাত করে নকশালরা বিভিন্ন এলাকাকে তাঁদের অধিকৃত তথাকথিত মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেন এবং অতঃপর নির্বিচারে চলতে থাকে তাঁদের ব্যক্তিহত্যা। তাঁদের হাতে নৃশংসভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে খুন হতে থাকেন নিচু তলার পুলিশ কর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষক, উপাচার্য, নিরীহ সাধারণ মানুষ, এমন কি ভিখারী ও ময়লা কাগজের সংগ্রাহকও। অথচ সরকার, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদাধিকারী তথা সমাজের ওপরতলার মানুষ তাঁদের আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পান। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুযোগ নিয়ে পুলিস, মিলিটারি ও সি আর পি একযোগে নকশালদের শায়েস্তা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে যেমন অনেক নকশালপন্থী তরুণের প্রাণ যায় তেমনই অনেক নির্দোষ ব্যক্তিরও জীবনহানি ঘটে। আবার পুলিসি নির্যাতনে অকারণে হয়রানি হয় বহু নিরীহ তরুণের। যখন-তখন সকাল-বিকেলে মিলিটারি-সি আর পি দিয়ে এলাকা ঘিরে ধরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হতে থাকে এবং বাড়ি বাড়ি থেকে অল্পবয়সী ছেলেদের তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে পোরা হতে থাকে। কলকাতা শহরে তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে স্কুল-কলেজে পাঠরত অল্পবয়সী কোনও ছেলে থাকাই পরিবারের পক্ষে এক বিষম দায় হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনে এত বড় বিপন্নতা আর কখনও আসেনি। গোটা পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হয়েছে এক ভয়াবহ রণক্ষেত্রে। পথে-ঘাটে পড়ে থাকছে গুলিবিদ্ধ অথবা গলা কাটা মানুষের রক্তাক্ত মৃতদেহ। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে বন্দুক-বোমার লড়াই। এলাকার অপরিচিত মানুষ সে এলাকায় ঢুকতে পারছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে চরম নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলা। সেখানে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেওয়া যাচ্ছে না, ভাঙা হচ্ছে মনীষীদের দেওয়াল চিত্র, পোড়ানো হচ্ছে লাইব্রেরি। প্রতি এলাকার মানুষ নকশালদের দাপটে সন্ত্রস্ত, তাদের বাড়ির দেওয়াল নকশালদের দেওয়াল লিখনে কলঙ্কিত এবং নকশালদের সমস্ত দাবি মেনে নিতে তারা বাধ্য। একই সঙ্গে পুলিসি সন্ত্রাসেও তারা বিপর্যস্ত। এক কথায় বাঙালি জীবনে এ এক নিদারুণ দুঃসময়। চারিপাশে শুধু ভয়মিশ্রিত স্তব্ধতা। উন্নয়ন নেই, অগ্রগতি নেই, আশা নেই, ভরসা নেই, নিশ্চয়তা নেই, নিরাপত্তা নেই এবং মানুষের জীবনের কোনও দাম নেই। অথচ একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের আর এক বাঙালি জীবনে তখন অন্য চিত্র । সেখানে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় বাঙালি মনে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

এই পরিস্থিতিতে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১সালের ১০ মার্চ। আগের দুটি নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নকশালপন্থীরা এই নির্বাচন বয়কটের ডাকই শুধু দেয়নি,

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে এমন হুমকিও তারা দিয়ে রেখেছিল। বস্তুতপক্ষে, নির্বাচনের আগে অন্তত চারজন নির্বাচন প্রার্থী খুন হন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ষীয়ান নেতা হেমন্তকুমার বসু। নির্বাচনের ঠিক কুড়ি দিন আগে এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা শ্যামপুকুরে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ আলোড়িত হয়ে ওঠে। সিপি আই(এম)-বিরোধী প্রায় সমস্ত দল একযোগে সিপি আই(এম)-কে এই খুনের জন্য দায়ী করে এবং নির্বাচনে এবংবিধ প্রচারের মাধ্যমে যথাসম্ভব ভোটের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু শুধু সেদিনই নয়, আজও পর্যন্ত কেউ এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। অর্থাৎ,জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় এক বর্ষীয়ান নেতার মৃত্যু নিয়ে সেদিন লজ্জাজনকভাবে ভোটের রাজনীতি করা হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, হেমন্ত বসু যে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন সেই ফরওয়ার্ড ব্লক গত বিশ বছর ধরে সি পি আই (এম) -এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক হয়ে আছে। সি পি আই (এম)-কে হেমন্ত বসুর হত্যাকারী ভাবলে অবশ্যই এই দল দীর্ঘদিন ধরে সি পি আই (এম)-এর সহযোগী হয়ে থাকতে পারত না। সেদিন কিন্তু এই দলের পক্ষ থেকে অন্যরকম ভাবা হয়েছিল এবং প্রচারও করা হয়েছিল। ভোটসর্বস্ব রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে একদিন এইভাবেই সত্য ও মিথ্যার ব্যবধানরেখা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল এবং, বলা বাহুল্য, আজও এই ধারা অব্যাহত।

উদ্ভ্রান্ত রাজনীতি ও কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন

দুবছর আগে যে যুক্তফ্রন্ট ছিল একজোট ও অভঙ্গুর, ১৯৭১ এর নির্বাচনে তার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এই নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস ও প্রধান বামপন্থী দলগুলি সি পি আই (এম) -এর সঙ্গ ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সি পি আই(এম) অবশ্য একটি সংযুক্ত বামফ্রন্ট গঠন করেই নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। তবে তার সঙ্গে যেসব বাম দল ছিল তারা সকলেই ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল। অতএব এই নির্বাচনে বাম ঐক্য না হওয়ায় বাম ভোট ভাগ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্বাচনে সর্বপ্রথম নব কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয়ত, এই নির্বাচন ছিল পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে নিরুত্তাপ নির্বাচন, জনসাধারণের মধ্যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও উৎসাহ-উদ্দীপনাই ছিল না। সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত শহরাঞ্চল, তখন নকশালদের খতম অভিযানে সন্ত্রস্ত। স্বভাবতই নির্বাচন নিয়ে উৎসাহিত হওয়ার অথবা আলাপ আলোচনা করার অবকাশ তখন ছিল না। উপরন্তু নকশালদের ভোট বর্জনের হুমকিতে এবং কয়েকজন নির্বাচন প্রার্থীকে খুন হতে দেখে ভোটাররাও তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। বস্তুত, নকশালদের হুমকির ভয়ে অধিকাংশ ভোটারই হয়তো ভোট দিতে যাবেন না, এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষেরও। তাই নির্বাচনের ধার্য তারিখ ১০ মার্চের বেশ কয়েকদিন আগে থেকে আকাশবাণীতে "কী ভাবছেন ? ভোট দেবেন কি দেবেন না? ভোট আপনি দেবেনই --- এই কয়েকটি কথা মানুষের মনে ভরসা যোগাবার জন্য অবিরাম সম্প্রচারিত হতে থাকে। অতঃপর নির্বাচনের দিন সকাল থেকে সারা দিন আকাশবাণীর পক্ষ থেকে ভোটারদের ঘন ঘন বলা হতে থাকে :"কই যান, ভোটটা দিয়ে আসুন।" ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য এই আবেদন নিঃসন্দেহে ছিল এক অভিনব ঘটনা।

আকাশবাণীর এই সম্প্রচারের ফলেই হোক অথবা যে কোনও কারণেই হোক, ভোটের দিন কিন্তু দেখা গেল যে ভোটাররা নকশালদের সমস্ত হুমকি অগ্রাহ্য করে দলে দলে ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন এবং মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি অতীতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ১৪ মার্চ ভোটের ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা যায় যে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। মোট ২৭৭টি আসনের মধ্যে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত বামফ্রন্ট পায় ১২৩টি আসন যার মধ্যে ১১১টি আসনই দখল করে সি পি আই(এম)। অন্যদিকে নব কংগ্রেস পায় ১০৫টি আসন। তবে অন্যান্য বড় বামদলগুলির প্রত্যেকেরই আসনসংখ্যা কমে যায় এবং বাংলা কংগ্রেস পায় মাত্র ৫টি আসন। ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে সি পি আই(এম)-এর সংযুক্ত বামফ্রন্টের দূরত্ব ছিল মাত্র ১৬টি আসনের। কিন্তু সি পি আই সহ বড় বামদলগুলি কেউই যে ফ্রন্টকে সমর্থন করবে না তা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর এস পি,এস ইউ সি আই ও ঝাড়খণ্ড পার্টি ছাড়া সি পি আই (এম)-এর ফ্রন্টের বাইরের বাকি সব দলের সমর্থন নিয়ে

নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস মিলিতভাবে সরকার গঠন করে। এই সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হন বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায় আর উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন নব কংগ্রেসের বিজয় সিং নাহার।

এই নতুন সরকার নিয়ে জনসাধারণের অবশ্য আদৌ কোনও মাথাব্যথা ছিল না বা এই সরকার সম্পর্কে তাঁদের কোনও প্রত্যাশাও ছিল না। কারণ বাঙালি মন তখন আচ্ছন্ন সম্পূর্ণ অন্য চিন্তায়, অন্য স্বপ্নে। নকশাল আন্দোলন তখনও ভাঙনের নেশায় মশগুল এবং সাধারণ মানুষ আক্রান্ত অভূতপূর্ব এক নিরাপত্তাহীনতায়। স্বভাবতই সরকার ও তার প্রশাসন যে ইতিবাচক কিছু করতে পারে এমন একটা ধারণা তখন রাজ্যবাসীর মন থেকে অন্তর্হিত। অন্যদিকে ইতিমধ্যে মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন এবং তারই প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী কলকাতা শহরে এসে এই শহরকে তাঁদের দ্বিতীয় গৃহ করে তুলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এপারের রোমান্টিক বাঙালি দুই বাঙলার মিলনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকারের অস্তিত্ব ও কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারুরই ছিল না।

অজয় মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় বারের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা শপথ নেয় ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল। কিন্তু গোড়া থেকেই এই সরকার ছিল বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থায় কারণ তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল নামমাত্র। এই পরিস্থিতিতে গুছিয়ে বসে সরকার কাজ শুরু করার আগেই দুমাস পরে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নিজের দলের বিধায়করা সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজেরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী তৈরি করেন এবং ফলে সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমর্থন বাড়ানোর জন্য ঝাড়খণ্ড পার্টির দুই বিধায়ককে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং এই ব্যবস্থা যখন পাকা হতে চলেছে তখন দিল্লি থেকে রাজ্য কংগ্রেসের প্রতি নির্দেশ আসে যে বাংলাদেশ যুদ্ধ ও বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত এক কোটি শরণার্থী নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্য এই দুর্বল সরকার থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের জন্য এই সরকার ইস্তফা দিক। তদনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেন। অতঃপর ১৯৭১ সালের ২৮ জুন পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

মনে রাখতে হবে যে নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই সেদিন পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের উদ্যোগে গড়া একটি নির্বাচিত কোয়ালিশন সরকার তাড়াহুড়ো করে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই জন্যই সরকার ভাঙার পিছনে যে কারণ তখন দেখানো হয়েছিল তা যথেষ্ট বলে মনে হয়নি এবং আজও মনে হয় না। তবে ঠিক কোন কারণে ও কার পরামর্শে কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা সেদিনও যেমন জানা যায়নি আজও তা জানার কোনও উপায় নেই। অবশ্য সেদিন কেউ কেউ অনুমানলব্ধ এই ধারণা করেছিলেন(এবং পরবর্তীকালের ঘটনায় এই ধারণার সত্যতা অনেকাংশেই প্রমাণিত হয়েছিল) যে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ১৯৭১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে সিদ্ধার্থ রায় রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হন এবং জয়ী হন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিদ্ধার্থ রায়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল পশ্চিমবঙ্গে র মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এবং ১৯৭১-এর নির্বাচনে প্রধান দুই দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে বেশ দূরে তখন, শোনা যায়, যে কোনও পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান। কিন্তু নব কংগ্রেসের পক্ষে তখন

অজয় মুখোপাধ্যায়কে পরিত্যাগ করে সিদ্ধার্থ রায়কে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না আর সি পি আই (এম) সঙ্গত কারণেই তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে নি। মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারলেও সিদ্ধার্থ রায় ১৯৭১-এর নির্বাচনের পর কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশ যুদ্ধ এবং এক কোটি শরণার্থীর সমস্যা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী খুবই চিন্তিত ও বিব্রত। স্বভাবতই তিনি বাঙালি মন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে এইসব সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আলাপ-আলোচনা করতেন এবং এই সুযোগে সিদ্ধার্থ রায় ইন্দিরা গান্ধীর একজন কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। অনেকের অনুমান এই যে অতঃপর নকশাল দমনের জন্য ও পশ্চিমবঙ্গের দখল নেওয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধার্থ রায় ইন্দিরা গান্ধীকে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে বলেন এবং নিজে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই অনুমানের সত্যতা বিচারের অবকাশ নেই, কিন্তু ঘটনা এই যে পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় এবং তারপর রাষ্ট্রপতি শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের দেখাশুনো করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭১-এর বিধানসভা নির্বাচন যে সরকার প্রসব করেছিল তার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র সাতাশি দিনের এবং এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক অস্বাভাবিক অবস্থায়। বোধ করি, এই কারণেই এই নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং এই নির্বাচন যে হয়েছিল এই কথাটাই অনেকে আজ বিস্মৃত হয়েছেন। তথাপি এই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ফলাফলের মধ্য দিয়ে রাজ্য-রাজনীতির সে সময়ের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এতে ভবিষ্যতের আভাসও ছিল। যেমন, নব কংগ্রেস ও প্রধান বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে লড়াই করে এই নির্বাচনে সি পি আই (এম) পেয়েছিল ১১১টি আসন। মনে রাখতে হবে যে নকশালপন্থীদের আঘাতে জর্জরিত সি পি আই(এম) তখন অনেকটা ছন্নছাড়া অবস্থায়। সর্বশক্তি দিয়ে সে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাতে পারেনি এবং নিবার্চনের সময় শহরাঞ্চলের অনেক এলাকায় তার ক্যাডারবাহিনী ঢুকতেই পারেনি। তাছাড়া বাম ঐক্যের সুবিধা সে ভোগ করতে পারেনি, বাম ভোট ভাগ হয়ে গিয়েছিল তথাপি ১১১টি আসন পেয়ে সি পি আই(এম)ই হয়েছিল বৃহত্তম দল। নিঃসন্দেহে সি পি আই (এম)-এর পক্ষে এ ছিল এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এই সাফল্যের পিছনে বড় অবদান ছিল গ্রামাঞ্চলের। অর্থাৎ, ১৯৬৯ সালে ক্ষমতায় এসে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সিপি আই(এম) কৃষক আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছিল তার সাফল্য এখন প্রমাণিত। ১৯৭১-এর নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সি পি আই(এম)-এর ব্যাপক ও সবল সমর্থনভিত্তি তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ, কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের আধিপত্য ভেঙে দিয়ে বাম ঐক্যের জোরে নয়, একক প্রচেষ্টায় সি পি আই(এম) গ্রামাঞ্চলে তার নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করে ফেলেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস শিবিরের ১০৭টি আসন(নব কংগ্রেস:১০৫ ও আদি কংগ্রেস:২) লাভও ছিল ১৯৬৯-এর তুলনায় এক বড় সাফল্য। তবে এই সাফল্য এসেছিল মূলত বাম ভোট ভাগ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ, ১৯৭১-এর নির্বাচন সন্দেহাতীতভাবে এই শিক্ষা দেয় যে পশ্চিমবঙ্গে বাম ভোট যদি ভাগ হয়ে যায় তাহলে নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য ঠেকানো খুবই কঠিন। আমরা পরে দেখব যে বিচক্ষণ সি পি আই(এম) এই শিক্ষা অনুযায়ী তার অবস্থান বদলাতে দেরি করেনি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থ রায়ই এখন রাজ্যের সর্বেসর্বা। সম্ভবত তাঁরই নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে পুলিস, মিলিটারি ও সি আর পি বাহিনী

সর্বশক্তি নিয়ে উদ্যত নকশাল নিধনে। কলকাতা মহানগরী ও অন্যন্য শহরাঞ্চলে নকশালরা অবশ্য এখন নানা কারণে রক্ষণাত্মক অবস্থানে। ওপরতলার নেতৃত্বের মহলে চরম মতবিরোধের কারণে সাধারণ নকশালকর্মীরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত এবং এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে বহু সমাজবিরোধীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে নকশালদের দলে। ফলে নকশাল আন্দোলন অনেকাংশেই রূপান্তরিত হয়েছে নিছকই এক নীতিহীন দুর্বৃত্ততায় যার পিছনে স্বাভাবিক কারণেই কোনও জনসমর্থন নেই। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুলিস ও সি আর পি নির্বিচারে নকশাল হত্যায় তৎপর এবং এই হত্যাকাণ্ডের বলি হতে হচ্ছে অনেক নিরীহ, নির্দোষ তরুণকে।

সেই সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয়েছে আধা সরকারি প্রতিরোধ বাহিনী এবং কংগ্রেসের তরুণ কর্মীবাহিনীও এখন অনেক বেশী জঙ্গী ও সক্রিয়। এদের সকলের প্রধান লক্ষ্য একটাই : বল প্রয়োগ করে নকশালদের শায়েস্তা করা। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে ময়দানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বিশিষ্ট নকশাল নেতা সরোজ দত্ত। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে পুলিসের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী যে কারণে অনেকে মনে করেন যে পুলিসই তাঁকে হত্যা করেছিল। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলের জনপ্রিয় সমজসেবী ও কংগ্রেস সমর্থক নির্মল চট্টোপাধ্যায় উন্মুক্ত রাস্তায় ও প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকজন আততায়ীর হাতে খুন হন। প্রচারিত হয় যে তিনি নকশালদের হাতে খুন হয়েছেন। এর কয়েক ঘন্টা পর থেকে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে ওই অঞ্চলে নকশালদের উৎখাত করার অভিযান চলে অগ্নিকাণ্ড, ভাঙচুর ও ব্যক্তিহত্যার মাধ্যমে। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল নজিরবিহীন এক বীভৎস তাণ্ডব যাতে অংশগ্রহণ করে পুলিস, প্রতিরোধ বাহিনী, কংগ্রেস বাহিনী, এমন কি অতীতে যাদের এলাকাতে নকশাল অ্যাকশনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত তাদেরও কেউ কেউ, যদিও প্রশাসন ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেদিন এই নকশাল উৎখাত অভিযানকে নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের হত্যার প্রেক্ষাপটে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। নির্মল চট্টোপাধ্যায়কে কারা হত্যা করেছিল তা সেদিনের মতো আজও অজ্ঞাত। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের পক্ষে সেদিন এটুকু উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছিল যে নির্মল চট্টোপাধ্যায়কে যারা হত্যা করেছিল তারা তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিল এবং হত্যার আগে তারা তাঁকে গুরু বলে সম্বোধন করেছিল। এই জন্যই অনেকে সেদিন সমস্ত ঘটনাটিকে নিছকই এক সাজানো ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন এবং এর পিছনে দেখতে পেয়েছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের হাত।

১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থীরা পিছু হটতে থাকে। কাশীপুর-বরানগরের উৎখাত অভিযানের পর তারা কার্যত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় একক প্রচেষ্টায় কিছু কিছু নকশাল অ্যাকশন চলতে থাকে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুলিসি নিগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তা থেমে যায়। ইতিমধ্যে পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেস তৈরি করেছে লাঠিধারী রক্ষীবাহিনী। তাদের ঘোষিত লক্ষ্য পাড়ায় কোনওভাবেই নকশালদের ঢুকতে না দেওয়া এবং পাড়ার শান্তি রক্ষা করা। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তারা এমনই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে থাকে ও দাপট দেখাতে থাকে যে সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে নতুন করে। অতঃপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুক্ত হয় পাক-অধীনতা থেকে। পরিণামে ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি খুবই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস বাহিনী আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের দাপটও খুব বেড়ে যায়। নকশালদের দেওয়াল লিখন মুছে ফেলে তারা নতুন করে দেওয়াল ভরাতে থাকে

'এশিয়ার মুক্তিসূর্য 'ইন্দিরা গান্ধীর প্রশস্তিতে। কাজকর্মে ও কথাবার্তায় তারা এমন একটা ভাব দেখাতে থাকে যেন কংগ্রেস ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলে সব পক্ষেরই রাজনৈতিক তৎপরতা যথারীতি দ্রুত বেড়ে যায়। সি পি আই ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করায় তার সঙ্গে এখন ইন্দিরা কংগ্রেসের কোনও বৈরিতা নেই। স্বভাবতই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এই দুই দল জোটবদ্ধ। অন্যদিকে ১৯৭১-এর নির্বাচন থেকে বাম ঐক্য সম্পর্কে সমুচিত শিক্ষা গ্রহণ করেছে সি পি আই(এম)। তাই নির্বাচনে সে অবতীর্ণ হয় সি পি আই ছাড়া অন্য সব বাম দলের সঙ্গে জোট বেঁধে, এমনকি এস ইউ সি আই-কেও লে সঙ্গে নিয়েছে। ১৯৭১-এর নির্বাচনী ফলাফলের কথা মাথায় রেখে এবং বাম ঐক্য সম্ভবপর হতে দেখে সি পি আই (এম) এখন খুবই আত্মবিশ্বাসী। ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে বামপন্থীরাই আবার পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করবেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ। ফলাফল হয় বড়ই বিচিত্র। যে কংগ্রেস মাত্র এক বছর আগে বাম ভোট বিভাজনের পূর্ণ সুযোগ পেয়ে ২৭৭টি আসনের মধ্যে ১০৫টি আসন পেয়েছিল এই নির্বাচনে বাম ঐক্য সত্ত্বেও সে এবার ২৮০টি আসনের মধ্যে ২১৬টি আসন পায় এবং তার সহযোগী সি পি আই পায় ৩৬টি আসন। পক্ষান্তরে যে সি পি আই (এম) ১৯৭১-এর নির্বাচনে বাম ভোট ভাগ হওয়া সত্ত্বেও ১১১টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হয়েছিল একবছর পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সে বারোটি জেলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং দখল করে মাত্র ১৪ টি আসন। অথচ এবার বাম ভোট ভাগ হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে, যে জ্যোতি বসু ১৯৭১-এ বরানগর কেন্দ্রে অজয় মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন ১৯৭২-এর নির্বাচনে তিনি একই কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী ও তুলনামূলকভাবে অনেক কম ওজনদার প্রতিদ্বন্দ্বী শিবপদ ভট্টাচার্যের কাছে ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। জ্যোতি বসু নির্বাচন চলাকালীনই তাঁর কেন্দ্রে রিগিং হওয়ার অভিযোগ এনে ভোট কেন্দ্রগুলি থেকে তাঁর এজেন্টদের প্রত্যাহার করেন এবংর নির্বাচনের অবিশ্বাস্য ফলাফল প্রকাশিত হলে সি পি আই (এম) ও তার সহযোগী দলগুলি নির্বাচনে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ আনে। অতঃপর ১৮ মার্চ তাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তারা কেউই বিধানসভায় যোগ দেবে না, এমনকি তাদের নির্বাচিত বিধায়করা শপথও নেবেন না।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পাঁচ বছর

১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনে রিগিং হয়েছিল কি হয়নি তাই নিয়ে সে সময় বিতর্ক চলেছিল অনেকদিন ধরে। যাঁরা শাসকপক্ষের সমর্থক ছিলেন তাঁরা স্বভাবতই রিগিং হয়েছিল—এ কথা মানেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে হয়েছিল—কংগ্রেস রিগিং করে নির্বাচনে বিপুল সাফল্য পায়নি, পেয়েছে অন্য কারণে। যেমন, তাঁদের মতে, বাংলাদেশ যুদ্ধে ঐতিহাসিক সাফল্যের পরিণামে দেশনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা কত বেড়েছিল রাজ্য কংগ্রেসের এই নির্বাচনী সাফল্যই ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অর্থাৎ, তাঁরা মনে করেছিলেন যে, যেহেতু এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে সে কারণে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আপ্লুত ভোটাররা পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর দল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল দুহাত উজাড় করে। সেইজন্যই যে গ্রামাঞ্চলে সি পি আই(এম) ইতিমধ্যেই তার সমর্থনের শক্ত ভিত তৈরি করে ফেলেছিল সেখানেও ভোটের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল কংগ্রেসের অনুকূলে। তাঁদের আরও বক্তব্য ছিল এই যে প্রায় তিন বছর ধরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও হত্যার রাজনীতিতে ক্লান্ত জনসাধারণ একটি স্থায়ী ও সবল সরকার চেয়েছিল এবং যেহেতু নকশালদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সি পি আই (এম) ও এই হত্যার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সে কারণে স্থায়ী ও সবল সরকার গড়ার দায়িত্ব তারা দিতে চেয়েছিল কংগ্রেসকেই। একজন বাঙালি অধ্যাপক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে ও ক্ষেত্র সমীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ১৯৭২-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে আদৌ কোনও রিগিং হয়নি।

অতি সরলীকৃত ও অত্যুৎসাহী এই সিদ্ধান্ত মানতে না পারলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে রিগিং অবিশ্বাসীদের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি ও সত্যতা ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল জনপ্রিয়তা ও জনসাধারণের হিংসা ও বিশৃঙ্খলার প্রতি চরম বিরূপতা নিঃসন্দেহে এই নির্বাচনে কংগ্রেসের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে সি পি আই (এম) অত্যন্ত নিপুণভাবে তার যে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিল তা এই জনপ্রিয়তা ও বিরূপতায় সম্পূর্ণরূপে ধসে যাবে একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। তাছাড়া ঘটনার যৌক্তিকতা (logic) মানতে হলে এই নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। কারণ মাত্র এক বছর আগে যথেষ্ট প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেও সি পি আই(এম) ১১১টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা নানা কারণে যতই বেড়ে থাকুক না কেন, সি পি আই(এম)-এর মাত্র ১৪টি আসন লাভ সমস্ত যৌক্তিকতা বিরোধী, যেমন যৌক্তিকতা বিরোধী জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, তরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখ সি পি আই(এম)-এর অতি বিশিষ্ট প্রার্থীদের অত্যন্ত কম ওজনের প্রায় অপরিচিত কংগ্রেস বা সি পি আই প্রার্থীদের কাছে হাজার হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার ঘটনা। অতএব ঘটনাপ্রবাহই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ এর বিধানসভা নির্বাচনে রিগিং হয়েছিল।

তবে সি পি আই(এম) ও তার সহযোগী বাম দলগুলি এই নির্বাচনে যে সর্বাত্মক রিগিংয়ের অভিযোগ এনেছিল সে অভিযোগও সম্ভবত ঠিক নয়। কারণ সব নির্বাচন কেন্দ্রে গুণ্ডামি বা কারচুপি হয়েছে তৎকালীন রাজনীতি-নিরপেক্ষ

ভোটারদের অভিজ্ঞতার দ্বারা তা সমর্থিত হয়নি। বস্তুতপক্ষে, নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস বা সি পি আই-এর জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে তাঁদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভোটের ব্যবধান ছিল অবিশ্বাস্য ভাবে হাজার হাজার। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এইসব কেন্দ্রে রিগিং হয়েছিল। জ্যোতি বসু তাঁর 'জনগণের সঙ্গে' পুস্তিকায় বলেছেন যে "৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে খোলাখুলি গুণ্ডামি করা হয়েছে এবং কোনও ভোটই হতে দেওয়া হয়নি।"এই বক্তব্যের সত্যতা সন্দেহাতীত কারণ ভোটের ফলাফলের সঙ্গে এই হিসেব মিলে যায়। কিন্তু ২০০টিরও বেশি (সঠিক সংখ্যা বলা হয়নি) কেন্দ্রে ব্যাপক কারচুপি হয়েছিল সি পি আই(এম)-এর এই অভিযোগ নিঃসন্দেহে ছিল অতিরঞ্জিত কারণ এই নির্বাচনে কংগ্রেস ছিল নিতান্ত এক দুর্বল প্রতিপক্ষ, এমন ধারণা করার কোনও অবকাশই ছিল না অথবা নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস হঠাৎ তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল এমন কোনও প্রমাণও কেউ দিতে পারেননি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর গৌরবময় সাফল্যে জনচিত্ত তখন এমনই আলোড়িত যে ১৯৭২-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের অনুকূলে কোনও হাওয়া ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। বস্তুত, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা এই যে ১৯৭২-এর নির্বাচনে কোনওরূপ রিগিং না করেও কংগ্রেস স্বচ্ছন্দে অন্ততপক্ষে ১৫০ টি আসন পেতে পারত এবং সরকার গঠন করতে পারত। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেদিন কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই তিনি রিগিংয়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এতে যে দলের সুনাম নষ্ট হবে ও চরম রাজনৈতিক ক্ষতি হবে একথা তিনি একবারও চিন্তা করেননি। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি অতীব ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ, দলের কথা তিনি চিন্তা করেননি, ভেবেছিলেন শুধু নিজের কথা। ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর রাজনৈতিক নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেস দলের চরম সর্বনাশের সূচনা এখান থেকেই।

অতঃপর পাঁচ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে আবার ফিরে এল সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের এক শাসন। সি পি আই অবশ্য এই সরকারের সমর্থক। তবে কংগ্রেস যেহেতু ছিল তিন-চতুর্থাংশ আসনের দখলদার সে কারণে সি পি আই-এর এই সমর্থনের প্রাপ্তিক মূল্য ছিল শূন্য। রিগিং সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলঙ্কের দাগ নিয়েই সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রিসভার কাজ শুরু হয়। লক্ষণীয় যে সি পি আই(এম) ও তার সহযোগী বাম দলগুলি এ ব্যাপারে তাদের চিৎকার অব্যাহত রাখলেও বিস্মরণশীল সাধারণ মানুষ কিন্তু অচিরেই রিগিংয়ের কথা ভুলে যায় আর সংবাদপত্রগুলি তো গোড়া থেকেই এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। তবে সি পি আই (এম) ও তার সহযোগী বাম দলগুলি বিধানসভা বয়কট করায় বিধানসভা কার্যত বিরোধী দলশূন্য হয়েই থাকে এবং এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনে পরিণত হয়।

অবশ্য এসব কিছুর তোয়াক্কা না করেই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় প্রবল হাঁকডাঁক করে তাঁর সরকার চালাতে শুরু করেন। কিন্তু গর্জনের তুলনায় বর্ষণ হয় সামান্যই। ১৯৬৭ সাল থেকে পাঁচ বছর ধরে ক্রমবর্ধমান খুনোখুনি, মারামারি, বিশৃঙ্খলা আর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই তারা আশা করেছিল যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ সিদ্ধার্থ রায়ের স্থায়ী সরকার তাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ করে দেবে। তারা আরও আশা করেছিল যে যেহেতু সিদ্ধার্থ রায় ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছের মানুষ(এমনই কাছের মানুষ যে ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে এলে সিদ্ধার্থ রায় নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে তাঁকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতেন) সেহেতু রাজ্যের উন্নয়নে তিনি কেন্দ্রের অকুণ্ঠ বদান্যতা পাবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুরানো ধারাই অব্যাহত্। যেমন, সারা রাজ্যে যে সন্ত্রাস

আর বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছিল নকশালপন্থীরা কংগ্রেসি শাসনকালে তা চলতেই থাকে। পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসের যুববাহিনীর ঔদ্ধত্যে ও দাপটে সাধারণ মানুষের হয়রানি হতে থাকে আর শিক্ষাক্ষেত্রে নকশালদের 'মহাজন পন্থা' অনুসরণ করে আমদানি করা হয় চরম অরাজকতা। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী নকশালরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলির পবিত্রতা নষ্ট করেছিল। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় আস্থাশীল হয়েও কিন্তু কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ওপর অশালীনভাবে ও ভয় দেখিয়ে ছড়ি ঘোরাতে থাকে।

একই সঙ্গে ছাত্র মহলে সুলভে সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত পবিত্রতা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে চালু করা হয় গণটোকাটুকি। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কংগ্রেসি ছাত্র সংগঠন দ্রুত দখল নিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই প্রহসনে পরিণত হয়। পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে কংগ্রেসি ট্রেড ইউনিয়ন চাপ সৃষ্টি করে, চোখ রাঙিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দখল নিতে থাকে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যখন এই বিশৃঙ্খলা, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে যখন এই অরাজকতা, তখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় সম্পূর্ণ নির্বিকার, বোধ করি, নিজ দলের প্রতিপত্তি বাড়তে দেখে তিনি উল্লসিত। কিন্তু এইসব তথাকথিত রাজনৈতিক সক্রিয়তায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যে ব্যাহত হচ্ছে, বিশৃঙ্খলা আর সন্ত্রাসের পরিবেশে কোনও উন্নয়নই যে সম্ভব নয় এবং ঔদ্ধত্য আর দাপট দেখিয়ে দলকে যে জনপ্রিয় করা যায় না এই সোজা কথাটা তিনি বুঝতে চাননি। অনেকের ধারণা এই যে তিনি দলের উন্নয়ন চাননি এবং রাজ্যের উন্নয়নও চাননি, তিনি চেয়েছিলেন নিজের উন্নয়ন। অর্থাৎ, তিনি নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কীর্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বিধান রায় হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধান রায়ের ছিল দূরদৃষ্টি, ছিল উন্নয়ন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত, ছিল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ছিল ব্যাপক কর্মযজ্ঞের আগ্রহ ও উদ্যোগ। পক্ষান্তরে সিদ্ধার্থ রায়ের এই গুণাবলী ও ক্ষমতা ছিল না। তাই তিনি শুরু করতে জানতেন, কিন্তু শেষ করতে পারতেন না এবং গিমিক আর চমক দিয়েই কার্যোদ্ধার করতে চাইতেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে তিনি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবেন। তদনুযায়ী শুরু হয় গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প। অবশেষে দেখা যায় যে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য খুঁটি পোঁতা হয়েছে মাত্র, কিন্তু বহু গ্রামই বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। আবার তাঁর আমলেই পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সঙ্কট দেখা দেয় এবং পরিণামে শুরু হয় লোডশেডিং। কিন্তু এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য যে ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা নিয়ে তার বিশেষ কোনও মাথাব্যথা ছিল না। রাজ্যের বিদ্যুৎ উন্নয়নের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি বলে মনে হয়েছিল বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ। এই নির্মাণ কাজ রেকর্ড সময়ের মধ্যে শেষ করিয়ে এবং বিদেশি টেবিল টেনিস প্রতিযোগীদের কাছ থেকে সাধুবাদ পেয়ে তিনি প্রভূত আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। কিন্তু জনশ্রুতি এই যে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকা ভেঙে তিনি এই স্টেডিয়াম তৈরি করান। এ থেকেই বোঝা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের কঠিন কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল না, তিনি ভালবাসতেন জাঁকজমক আর গিমিক। এই গিমিকের মোহেই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি প্রতি মাসে একবার করে বেতার ভাষণের মাধ্যমে জনগণের কাছে তাঁর সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার ফিরিস্তি দিতে শুরু করেন।

কিন্তু প্রকৃত উন্নয়নমূলক ও ইতিবাচক কাজের সংখ্যা ছিল এত কম যে অল্পদিন পরেই এই বেতার ভাষণ বন্ধ হয়ে যায় যেহেতু সাফল্যে তালিকায় বলার মতো বিশেষ আর কিছু ছিল না। একইভাবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার সমস্যাবলী বোঝার জন্য ও সরেজমিনে তদারক করার জন্য তিনি প্রতি জেলায় একবার করে ক্যাবিনেট মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেন। জেলাস্তরে মন্ত্রিসভার এই বৈঠকের জন্য বহু টাকা অকারণে খরচ হতে থাকে, কিন্তু জেলাগুলি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। মুখ্যমন্ত্রী মনে . করেছিলেন যে প্রতিটি জেলায় একটি করে স্টেডিয়াম তৈরি, করা সবচেয়ে জরুরি কাজ এবং এই মর্মে সরকারি নীতিও ঘোষিত হয়। অতঃপর বেশ কয়েকটি প্রস্তাবিত জেলা স্টেডিয়ামের শিলান্যাসও তিনি করে ফেলেন। কিন্তু স্টেডিয়াম তৈরির কাজ অসমাপ্তই থেকে যায়।

ইতিমধ্যে ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন। সেই সময়ের দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকের অভিমত অনুযায়ী এই জরুরি অবস্থা জারি করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর আইনি পরামর্শদাতা ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। হয়তো সেই কারণেই জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দাপট খুব বেড়ে যায়। শোনা যায়, জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর দিল্লি থেকে ফিরে বিমানবন্দরে নেমেই তিনি জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার কপি হাতে নিয়ে অনুগতদের কাছে ঘোষণা করেন যে এবার তিনি সকলকে দেখে নেবেন। বলা বাহুল্য, এই কথা অনুযায়ীই তিনি কাজ শুরু করেন। একটি সংবাদপত্র তাঁর ক্রীতদাসত্ব মেনে নিতে পারেনি বলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের মালিকের বাড়িতে তিনি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের হানার ব্যবস্থা করেন এবং দুই বিশিষ্ট বাঙালি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত এবং গৌরকিশোর ঘোষ তাঁদের সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রায়শই তাঁর ও তাঁর সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে বাধ্য হতেন বলে তিনি তাঁদের জেলে পোরেন। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে দল ও মন্ত্রিসভাকে নিজের তাঁবেদার করে রাখতে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন (ওয়াংচু কমিশন)বসান।

তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের পাঁচবছরে সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক ক্ষতি করেছিলেন, তবে, বোধহয়, তিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিলেন নিজের দলের। যেমন; তাঁর পরিচালিত নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল তা তিনি নিজে গায়ে মাখেননি এবং পাঁচ বছর ধরে বহাল তবিয়তেই সরকার চালিয়েছিলেন। কিন্তু এতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল দলের। কারণ জনসাধারণের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এ জন্য পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে বড় মাসুল দিতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রত্যেক দলনেতারই গোড়া থেকে পরবর্তী নির্বাচন সম্পর্কে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা থাকে এবং তদনুসারে দল ও সরকার পরিচালিত হয়। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আবার বিপক্ষ সম্পূর্ণ হীনবল হয়ে পড়েছে এমন সিদ্ধান্তে আসারও কোনও অবকাশ ছিল না। মুখে তিনি যাই বলুন অন্তর থেকে তিনি খুব ভালই করেই জানতেন যে সি পি আই(এম)-এর ১৪টি আসন পাওয়া তার নখদন্তহীন হয়ে পড়ার সূচক নয় । তথাপি পরবর্তী নির্বাচনে দলের সম্ভাব্য জয়-পরাজয় সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার।

এর কারণ হিসাবে অনেকে মনে করে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্বই সিদ্ধার্থ রায়ের অন্তিম লক্ষ্য ছিল না, তা ছিল তাঁর কাছে লক্ষ্যপূরণের এক প্রাথমিক ধাপ এবং দিল্লির মসনদ দখলই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ লক্ষ্য। দলের তিনি ক্ষতি করেন আর একদিক থেকেও। বিধান রায় ও প্রফুল্ল সেনের আমলে রাজা কংগ্রেস দল মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে চলত না।

অর্থাৎ, তার সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং তা সরকার ও প্রশাসন নির্ভর ছিল না। বলা বাহুল্য, এই স্বাতন্ত্র্যই ছিল তার শক্তির উৎস। সিদ্ধার্থ রায় এই ধারার আমূল পরিবর্তন করেন। তাঁর আমলে গোড়ার দিকে কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন আব্দুস সাত্তার। সজ্জন ও বিবেকবান ব্যক্তি হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল। সিদ্ধার্থ রায় কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসেন এবং কংগ্রেস সভাপতি করেন তাঁরই বিশেষ অনুগত অরুণ মৈত্রকে। অতঃপর দলের ওপর খবরদারি করতে থাকেন তিনিই, কংগ্রেস সভাপতি নয় এবং পরিণামে রাজ্য কংগ্রেসের বাইরের ঠাটবাট ও আস্ফালন অপরিবর্তিত থাকলেও ভিতরে ভিতরে তার শক্তিক্ষয় হতে থাকে।

তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে পাঁচ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চালিয়ে সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কিছু স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। যেমন, তিনিই প্রথম বাঙালি রাজনৈতিক নেতা যিনি এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলিকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে নির্বাচনের পবিত্রতার তোয়াক্কা না করে কারচুপি করে, গুণ্ডামি করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নির্বাচন জেতা যায়। আমরা পরে দেখব যে এই শিক্ষাকে আরও নিখুঁতও মসৃণ করে এখনও কাজে লাগানো হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তিনিই রাজ্যের প্রথম কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী যিনি প্রশাসনে ও অন্যত্র দলবাজির প্রবর্তন করেন যে ধারা আজও অব্যাহত। তৃতীয়ত, নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে অত্যন্ত কৌশলে তিনি কংগ্রেস দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আগুন জ্বালিয়ে তোলেন এবং তার শাসনকালের শেষ দিকে এই ঘরোয়া বিবাদ এমনই চরম আকার ধরে যে বিবদমান দুই কংগ্রেসী ছাত্রগোষ্ঠীর খুনোখুনি ও মারামারির কবলে পড়ে মফস্বল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উপাচার্যকে প্রাণ বাঁচাতে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিতে হয়। সিদ্ধার্থ রায়ের জন্ম দেওয়া কংগ্রেসের এই অভ্যন্তরীণ কলহের ট্র্যাডিশন আজও চলেছে।

তবে সিদ্ধার্থ রায় কয়েকটি ভাল কাজও করেছিলেন। যেমন, তাঁরই আমলে পাশ হয় বর্গা আইন যা পরবর্তীকালে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। দ্বিতীয়ত, শঙ্কর ঘোষ ও গোপাল দাসনাগকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে এসে তিনি খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন কারণ তদানীন্তন অফিসারদের অভিমত অনুযায়ী এই দুই মন্ত্রী প্রশাসনিক কাজকর্মে ছিলেন অতীব দক্ষ। তৃতীয়ত, অন্তত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে তিনি কোনও দলবাজি করেননি। সুশীল মুখোপাধ্যায়ের মতো অত্যন্ত যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদকে তিনি সব তরিকারীদের উপেক্ষা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করেছিলেন। চতুর্থত, তাঁর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ নিয়ে যত বিরূপ সমালোচনাই হোক না কেন, বিশ্বমানের একটি ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের এক উল্লেখযোগ্য নজির তিনি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এইসব ভাল কাজের তুলনায় তাঁর খারাপ কাজের পাল্লা এত ভারী ছিল যে পাঁচ বছর পরে মাথা নিচু করেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়।

বাম রাজনীতির জয়যাত্রা

পশ্চিমবঙ্গে যখন সিদ্ধার্থ রায়ের নিধিরাম সর্দারি শাসন চলছে তখন সি পি আই (এম) ও তার সহযোগী বাম দলগুলি কিন্তু তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি এই অর্থে যে তারা সর্বশক্তি দিয়ে এই সরকারের বিরোধিতা করতে পারেনি। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য তারা মিটিং-মিছিল করেছিল অনেক। কিন্তু যে সরকারকে তারা অবৈধ বলে মনে করেছিল এবং যে সরকার ইতিবাচক উন্নয়নের আলো না জ্বালিয়ে ব্যস্ত ছিল চমকের হাউইবাজিতে তার বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল প্রত্যাশিত। ১৯৬৭ সালে প্রফুল্ল ঘোষের সরকারকে তারা অবৈধ বলে মনে করেছিল বলেই তার বিরুদ্ধে তারা এইভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এবার তুলনামূলকভাবে তারা অনেকটাই ছিল নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ। আসলে বাম দলগুলির অগ্রণী সি পি আই(এম) এই পর্বে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি, অর্থাৎ, কংগ্রেস সরকার ও দলের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায়নি। সি পি আই(এম) এই অবস্থান নিয়েছিল সম্ভবত এই কারণে যে বিগত কয়েক বছরে নকশালদের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণামে তাকে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। তাই নতুন যুদ্ধের ফ্রন্ট সে আর খুলতে চায়নি। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিগত পাঁচ বছরে দুবার সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে সি পি আই(এম)-এর বিপ্লবী সত্তা এখন স্তিমিত। তাত্ত্বিক স্তরে এখনও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই তার ঘোষিত লক্ষ্য হলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রধান লক্ষ্য হল নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে শাসনক্ষমতা দখল করা এবং দখলীকৃত এই ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেকে আরও ক্ষমতাশালী করে তোলা। তার বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবর্গ এ-ও বুঝে গেছেন যে প্রতিবাদী কোনও জঙ্গী আন্দোলন যে বিশৃঙ্খলা প্রসব করবে তাতে বিরূপ হবে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী যা ভোটারদের একটা বড় অংশ। এই সব বিবেচনার ভিত্তিতে সি পি আই (এম) এখন অনেক সাবধানী; অনেক নরমপন্থী এবং শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে ভোটের রাজনীতির টানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও এখন কাছে পেতে ইচ্ছুক।

মূলত সি পি আই (এম)-এর এই রক্ষণাত্মক অবস্থানের জন্যই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই বামপন্থীরা যে বাংলা বন্ধ ডাকে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। একইভাবে ১৯৭৪ সালের ১৫ মে ভারত বন্ধের দিনও পশ্চিমবঙ্গ সচল থাকে। ১৯৭৪ সালে গুজরাত ও বিহার আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল সি পি আই (এম)-এর উদ্যোগের অভাবে পশ্চিমবঙ্গ 'শুধুই ঘুমায়ে রয়'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নিজ নেতৃত্বে কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতেসি পি আই (এম) তখন এতই অনিচ্ছুক ও অক্ষম যে মুখরক্ষার্থে তাকে জনসঙ্ঘ ও সংগঠন

কংগ্রেসের সঙ্গে একই মঞ্চে আসীন হয়ে নাগরিক সম্মেলন করতে হয় ১৯৭৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে।

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আঙিনায় আবির্ভূত হন জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং তাঁর সহায়তায় সি পি আই(এম) তার প্রতিবাদী ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কিছুটা সুযোগ পায় (জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালের ৬ জুন কলকাতা শহরে আয়োজিত হয় গণতন্ত্রের সপক্ষে প্রতিবাদী নাগরিকদের মহামিছিল। এই মিছিলে যোগদান করে সি পি আই (এম) তার সংগ্রামী অবস্থানের পরিচয় রাখার সুযোগ পায়। তবে এজন্য তাকে মূল্যও দিতে হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের শর্ত ছিল এই যে এই মহামিছিলে যোগদানকারী কোনও দল তার নিজের পতাকা বা ফেস্টুন ব্যবহার করতে পারবে না, অর্থাৎ, মিছিল হবে অরাজনৈতিক। একটি কট্টর কমিউনিস্ট দল হয়েও সি পি আই(এম)-কে এই শর্ত মেনে মহামিছিলে পতাকা বর্জন করতে হয়, অর্থাৎ,জনসমক্ষে নিজের লড়াকু ভাবমূর্তি বজায় রাখতে তাকে বড় রকমের আপস মেনে নিতে হয়। অতঃপর ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি করা হলে সি পি আই (এম)-এর রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই অভূতপূর্ব স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার কোনও প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় না, তার কোনও মিটিং নেই, মিছিল নেই, পোস্টার নেই, দেওয়াল লিখন নেই। বস্তুত, সে সময় সেন্সরশিপের কোপে পড়ে 'গণশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ মাঝে মাঝে ফাঁকা থাকত বলেই বোঝা যেত যে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) নামে একটি বাম রাজনৈতিক দল আছে। অন্যথায় তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই ছিল দুষ্কর।

অতঃপর লোকসভা ভেঙে দিয়ে সংসদীয় নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলে এবং জরুরি অবস্থা শিথিল করা হলে সি পি আই (এম) বেরিয়ে আসে তার স্বেচ্ছানিবার্সন থেকে। বিপদমুক্ত অনুকূল পরিবেশে আবার শুরু হয় তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ। দীর্ঘ ঊনিশ মাস পরে সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে প্রথম বামপন্থী মিছিল কলকাতা শহরে বের হয় ১৯৭৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এবং এককভাবে সি পি আই (এম) ময়দানে সমাবেশ ডাকে ১১ ফেব্রুয়ারি। সিদ্ধার্থ-জমানায়, বিশেষত জরুরি অবস্থা চলাকালীন, সি পি আই (এম)-কে এইভাবে রাজনৈতিক জড়ভরতে পরিণত হতে দেখে কেউ কেউ ভাবতে থাকেন যে সি পি আই(এম) আর সংগ্রামে বিশ্বাসী একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট দল নেই, তা রূপান্তরিত হয়েছে সুযোগসন্ধানী এক সংসদীয় দলে যে প্রতিপক্ষ প্রবল শক্তিশালী হলে ঝটিতি অস্ত্রসংবরণ করে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে আর যুদ্ধের ভেরী বাজায় তখনই যখন পরিবেশ নিতান্ত অনুকূল, অর্থাৎ, প্রতিপক্ষের হাতে মার খাওয়ার যখন কোনও আশঙ্কা থাকে না। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে কেউ কেউ কংগ্রেসের ওপর ভরসা রাখতে পেরেছিলেন। বস্তুত,

কংগ্রেসের কবর ইতিমধ্যেই খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ ও সিদ্ধার্থ-সরকারের অপদার্থতায় পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরের মানুষ তখন চরম ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল পরবর্তী নির্বাচনে।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ১৬ মার্চ। সি পি আই(এম) ১৯৭১-এর নির্বাচনে সি পি আই ছাড়া বাকি প্রায় সব অকংগ্রেসি দলগুলিকে নিয়ে যে বামফ্রন্ট গঠন করেছিল এই নির্বাচনে সেই বামফ্রন্টকে নিয়েই সে নির্বাচনে অবতীর্ণ। তফাত শুধু এই যে এবার এস ইউ সি আই তার সঙ্গে নেই। ১৯৭৫-এর গোড়ার দিকেই এস ইউ সি আই মতাদর্শগত কারণে সি পি আই (এম)-এর নীতির বিরোধিতা করতে থাকে। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারিতে সি পি আই (এম) সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে যে নাগরিক সম্মেলন করে এবং জরুরি অবস্থার সময় যখন প্রফুল্ল সেনকে অন্যতম আহৰায়ক করে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাটিক রাইটস নামে একটি কমিটি গঠন করে তখন তার তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই। তার বক্তব্য ছিল এই যে পশ্চিমবঙ্গে সে সময় বামপন্থীরাই ঐক্যবদ্ধভাবে উপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম এবং দক্ষিণপন্থী সংগঠন কংগ্রেসের সাহায্য নেওয়ার যেমন প্রয়োজন নেই তেমনই মতাদর্শগত কারণে তা অবাঞ্ছনীয়ওj) সি পি আই(এম) এস ইউ সি আই-এর এই বক্তব্যে কর্ণপাত না করায় দুই পক্ষের মধ্যে স্বভাবতই ব্যবধান তৈরি হয়। অতঃপর নির্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টে থাকার ব্যাপারে এস ইউ সি আই-এর ওপর সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। এস ইউ সি আই এই শর্ত মানতে অস্বীকার করে এবং বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসে।

উল্লেখ্য যে প্রফুল্ল সেন সম্পর্কে এস ইউ সি আই এর বিরূপতা সে সময় সি পি আই(এম) মেনে নিতে না পারলেও বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার দুবছরের মধ্যে সিপি আই(এম) একই অবস্থান নেয় যখন প্রফুল্ল সেনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে এই দল প্রফুল্ল সেনকে চিহ্নিত করে কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ ও সমাজবিরোধীদের সংগঠক হিসাবে।) তবে ১৯৭৫-৭৭ এর বিপন্ন পর্বে নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তায় আচ্ছন্ন সি পি আই(এম)-এর খুবই প্রয়োজন ছিল প্রফুল্ল সেনকে। আবার ১৯৭৭-এর সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে জয় প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে যখন জনতা পার্টি গঠিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে প্রফুল্ল সেন খুবই প্রেয় সি পি আই(এম)-এর কাছে। কারণ পাঁচ বছরের রাজনৈতিক শীতনিদ্রার পর সি পি আই (এম) তখন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত নয় এবং জনসমর্থনের গতি সম্পর্কেও তার স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আসন

সমঝোতার ব্যাপারে রফা করে সি পি আই (এম) ও তার নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট লোকসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় পশ্চিমবঙ্গে।

এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই সি পি আই (এম) অভিযোগ আনে যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে কংগ্রেস ও সি পি আই-এর নেতৃত্বে ব্যাপক হামলা, সন্ত্রাস ও রিগিং হয়েছে এবং অন্তত দুটি কেন্দ্রে তারা পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা করেও এবং প্রায় সব বামদলকে ঐক্যবদ্ধ করেও সি পি আই(এম) নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হতে পারেনি এবং সেইজন্যই সম্ভাব্য খারাপ ফলের উপযুক্ত ব্যাখ্যা সে অগ্রিম দিয়ে রাখতে চেয়েছিল, অর্থাৎ, ভোট গণনার আগেই রিগিংয়ের অভিযোগ জানিয়ে রেখেছিল। বলা বাহুল্য, এই অভিযোগ অসত্য ছিল এবং তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ছিল ভোটের ফলাফল। যেমন যে আরামবাগ কেন্দ্রে রিগিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছিল সেখানে জনতা পার্টি প্রার্থী প্রফুল্লচন্দ্র সেন রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। আবার যে দুটি কেন্দ্রে সি পি আই(এম) পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছিল সে দুটিতেই জয়ী হয়েছিলেন সি পি আই(এম) প্রার্থী। নির্বাচনে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে গ্রেস পায় মাত্র ৩টি আসন। অন্যদিকে জনতা পার্টি পায় ১২টি আসন আর সি পি আই(এম) ১৮টি আসন পেয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনের দখলদার হয়। কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত হন ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম অকংগ্রেসি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন জনতা পার্টি নেতা মোরারজি দেশাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই মন্ত্রিসভার সদস্য হন জনতা পার্টি নেতা ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ।

সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৭৭ সালের ১২ জুন ও ১৪ জুন। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন পেয়েও কিন্তু সি পি আই(এম) তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নয়, অর্থাৎ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজের তথা বামফ্রন্টের সাফল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় নয়। এইজন্যই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে এই নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে উদ্যোগ নেয় সিপি আই(এম)। জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকায় পশ্চিমবঙ্গে তখন জনতা পার্টির প্রান্তিক রাজনৈতিক মূল্যও কম নয়। এই বিবেচনাও সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগের পিছনে কাজ করেছিল। অতঃপর সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃবর্গের সঙ্গে জনতা পার্টি নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আসন সমঝোতা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু আসন নিয়ে দরকষাকষিতে অনড় অবস্থান নেন জনতা নেতা প্রফুল্ল সেন। সাংগঠনিক শক্তি ও প্রভাবের বিচারে সি পি আই(এম) বামফ্রন্টের জন্য গরিষ্ঠসংখ্যক আসন দাবি করে। অন্যদিকে প্রফুল্ল সেন বামফ্রন্টকে মাত্র ৯০টি আসন ছেড়ে দিতে চান।

সমঝোতায় আন্তরিকভাবে আগ্রহী সি পি আই(এম) শেষ পর্যন্ত জনতা পার্টিকে ৫২ শতাংশ আসন ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু অনমনীয় থাকেন প্রফুল্ল সেন। ফলে আলোচনা ভেস্তে যায় এবং বামফ্রন্ট কোনওরূপ সমঝোতা ছাড়াই ২৯৪টি আসনের প্রত্যেকটির জন্য এককভাবে প্রার্থী দেয়।

প্রফুল্ল সেন যদি তখন সি পি আই (এম)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করতেন তাহলে রাজ্য-রাজনীতি সম্ভবত ভিন্ন খাতে বইত। কাজেই সি পি আই (এম) তথ্য বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতায় রাজি না হয়ে তিনি বড় রকমের ভুল করেছিলেন। আসলে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে তিনি বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি ১২টি আসন পাওয়ায় এবং অতঃপর কেন্দ্রে জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ায় তিনি ভেবেছিলেন যে একক প্রয়াসেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি বিপুল সাফল্য পাবে। কিন্তু তাঁর এই মূল্যায়ন যে সম্পূর্ণ ভুল ছিল নির্বাচনের ফলাফলেই তা প্রমাণিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে বামফ্রন্টের দেওয়া আসন সমঝোতার প্রস্তাব প্রফুল্ল সেন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে। অর্থাৎ, তিনি চেয়েছিলেন আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে এবং বামফ্রন্টকে বেশি আসন ছেড়ে দিলে তাঁর এই ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হবে না বলেই তিনি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। এই ধারণা সত্য হোক আর না হোক, প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্টের যে কোনও বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং পারস্পরিক বিশ্বাস যেখানে নেই সেখানে কোনও সমঝোতাই সম্ভব নয়, এমনকি রাজনৈতিক সমঝোতাও নয়।

১২ জুন ও ১৪ জুন এই দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার পর ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে বামফ্রন্ট তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসন পেয়েছে আর সি পি আই(এম) একাই অর্জন করেছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা; অন্যদিকে কংগ্রেস ও তার সহযোগী সি পি আই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে পায় ২৩১টি আসন, সি পি আই (এম) এককভাবে দখল করে ১৭৮টি আসন, কংগ্রেস পায় ২০টি আসন আর সি পি আই-এর ভাগ্যে জোটে মাত্র ২টি আসন। মজার ব্যাপার এই যে, যে জনতা পার্টি নির্বাচনের আগে ৫২ শতাংশ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতায় বিমুখ হয়েছিল সেই জনতা পার্টি এই নির্বাচনে পায় মাত্র ২৯টি আসন। বলা বাহুল্য, এই নির্বাচনী ফলাফল সব পক্ষের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাওয়া যে প্রবল তা বোঝা গিয়েছিল তিন মাস আগে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে। আসলে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি র‍্যাডিকাল পশ্চিমবঙ্গ ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্র হনন আদৌ বরদাস্ত করতে পারেনি। তাই সংসদীয় নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গবাসী ইন্দিরা গান্ধীকে উৎখাত করার রায় দেয়। তবে সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের

অপদার্থতা সম্পর্কে জনসাধারণের ক্ষোভ যে চরম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে একথা রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ যেমন বুঝতে পারেননি তেমনই অকংগ্রেসি দলগুলিও উপলব্ধি করতে পারেনি। অতএব রাজ্য কংগ্রেস বিধানসভায় মাত্র ৬.৮০ শতাংশ আসন পাবে এই ঘটনা ছিল সকলের ধারণার বাইরে।

আবার কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের যে খোয়াব দেখেছিল নির্বাচনী ফলাফলে তাও ভেঙে যায়, অর্থাৎ, আশাভঙ্গ হয় জনতা পার্টিরও। র‍্যাডিকাল পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রেও প্রমাণ রাখে যে ভুঁইফোঁড় জনতা পার্টির হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিতে সে অনিচ্ছুক। তবে জনতা পার্টির এই ব্যর্থতা বামপন্থীরাও আগে থেকে অনুমান করতে পারেননি। পারলে তাঁরা নিশ্চয়ই জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে উদ্যত হতেন না। আবার বামপন্থীদের আসন সমঝোতার প্রয়াস এ-ও প্রমাণ করে যে সি পি আই(এম) যে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং বামফ্রন্ট যে তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসন পেয়ে অসামান্য এক সাফল্যের নজির রাখবে একথা পি আই(এম) সহ বামফ্রন্টের কোনও শরিকই কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু এই অভাবনীয়ই বাস্তব হয়ে দেখা দেয় ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে।

মূলত নেতিবাচক ভোটের পরিণামেই বামফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক সাফল্য এসেছিল (পরবর্তীকালে সিপি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়)। অর্থাৎ, রাজ্যবাসী প্রকৃতপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন কংগ্রেসের বিপক্ষে। ১৯৬৯-এর নির্বাচনে কিন্তু বামফ্রন্ট বড় মাপের সাফল্য পেয়েছিল ইতিবাচক ভোটের পরিণামে, অর্থাৎ, ওই নির্বাচনে ভোটাররা বামফ্রন্টকে জয়ী করতে চেয়েছিল বলেই কংগ্রেস ধরাশায়ী হয়েছিল। তবে ১৯৬৯এ যেমন বাম ভোট ভাগ হয়নি ১৯৭৭-এও তেমনই বাম ভোট অনেকাংশে ভাগ হয়নি এবং স্বভাবতই এর সুফল প্রতিফলিত হয়েছে ভোটের বাক্সে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭২-এর নির্বাচন থেকেই বিচক্ষণ সি পি আই(এম) বাম ভোট বিভাজন এড়াতে সতর্ক হয়েছে এবং ১৯৭৭-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও বাম ঐক্য সম্পর্কে তার সচেতনতা ও সতর্কতা অব্যাহত। তাই নির্বাচনের পর জ্যোতি বসু সি পি আই(এম)-এর সরকার গঠন না করে অন্যন্য শরিকদের নিয়ে গঠন করেন বামফ্রন্ট সরকার এবং সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে 'বামফ্রন্টকে চোখের মণি'র মতো রক্ষা করার স্লোগান পশ্চিমবঙ্গে ধ্বনিত হতে থাকে পরবর্তী দশ বছর ধরে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন এক স্থায়ী কোয়ালিশন সরকারের শুরু এখান থেকে, যে কোয়ালিশন বিশ বছর ধরে অটুট থেকে বিশ্বরেকর্ড করেছে। এই (কোয়ালিশন রেকর্ড করেছে আরও এই কারণে যে পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক দেশে এমন ধরনের কোয়ালিশনের নজির নেই। এই কোয়ালিশন একদল প্রধান (one

party dominant) কোয়ালিশন যেখানে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তার অধিকারী হয়েও বহুদল শাসনের প্রবক্তা ও উদ্যোক্তা) বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের এই কোয়ালিশনের চেহারা ও চরিত্র কী দাঁড়িয়েছে তা যথাসময়ে আলোচিত হবে।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম এক বছর

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসু চারজন মন্ত্রী সহ শপথ নেন ১৯৭৭ সালের ২১ জুন। দুদিন পরে শপথ নেন আরও ষোলজন মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীসহ একুশজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঘোষণা করেন যে তাঁর সরকারের লক্ষ্য হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সৎ, পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ সরকার উপহার দেওয়া। পাশাপাশি এ-ও দেখা যায় যে দলীয় কর্মীরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উত্তাল নন, তাঁরা যথেষ্ট সংযত এবং বিজয়ী সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকেও বন্ধ করে দেওয়া হয় তথাকথিত বিপ্লবিয়ানার সাড়ম্বর প্রদর্শনী। বস্তুত, এখন থেকে সি পি আই(এম)-এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের স্থান হয় দলের খাতা-কলমে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যেতে থাকে যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থাশীল একটি বুর্জোয়া দলের মতোই সি পি আই (এম) এখন আগ্রহী ভোট পেতে এবং ক্ষমতাসীন হয়ে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে সরকার চালাতে। এমনকি এ-ও দেখা যেতে থাকে যে সরকারের প্রধান ও অন্যান্য কর্তারা শিল্পপতিদের সঙ্গে তাঁদের যে কোনও সংঘাত ও বৈরিতার সম্পর্ক নয়, একথা বোঝাতে ব্যস্ত। এ থেকেই বোঝা যায় যে ১৯৬৭ সালে যে সি পি আই (এম) উদ্যোগী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসি সরকার গঠন করেছিল দশ বছরের মধ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংসদীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই দল এখন অনেক পরিণত ও প্রায়োগিক কৌশলে দক্ষ, যে সার কথা সে বুঝে গেছে তা হল এই যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে ভারতবর্ষের মতো একটি বড় যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্যে শাসনক্ষমতার দখল পেয়ে কোনও বিপ্লব করা যায় না, বরং সংসদীয় রাজনীতির পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বিঘ্নে ও শ্রেণীসংঘাত এড়িয়ে শাসনক্ষমতায় দীর্ঘকাল ধরে থাকতে পারলে পার্টিকে অনেক বড় ও শক্তিশালী করে তোলা যায় এবং সেই সুবাদে শেষ পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতিতেও ছড়ি ঘোরানো যায়।

সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট শাসনের কুড়ি বছরের ইতিহাস এই উপলব্ধিকেই বাস্তবে কার্যকর করার ইতিহাস। এতে সাধারণভাবে জনসাধারণের কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়, বরং গোটা ব্যাপারটাই তাঁদের পক্ষে স্বস্তিদায়ক। কারণ একটি বিপ্লবী দল যখন বিপ্লবের লক্ষ্যে বিমুখ হয়ে সংসদীয় রাজনীতির নিয়মানুগ পথে চলতে মনস্থ করে তখন সাধারণ মানুষ এই কথা ভেবে আশ্বস্ত হয় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসে বড় রকমের কোনও ওলটপালট ঘটবে না এবং সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী চলবে যার ফলে দল ও সরকার নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু থাকবে না। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর

পশ্চিমবঙ্গবাসীর মানসিক অবস্থা ও প্রত্যাশা ছিল ঠিক এইরকম। মুখ্যমন্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ সরকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জনসাধারণের এই স্বস্তি ও প্রত্যাশা অনেক বেড়ে যায় যেহেতুপরিচ্ছন্ন ও দক্ষ সরকার দিতে প্রয়োজন হয় যৌক্তিকতা, স্বচ্ছতা ও পক্ষপাতহীন কর্মময়তার।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করলে কিন্তু দেখা যায় যে কার্যক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ সরকার সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি পালনের বিশেষ আগ্রহ এই সরকারের নেই। সরকারের পরিচ্ছন্নতা ও দক্ষতা অনেকাংশেই নির্ভর করে তার প্রশাসনিক কাজকর্মের উৎকর্যের ওপর। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী দশ বছরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার প্রভাবে রাজ্য প্রশাসনের কাজকর্মের মান খুবই নেমে গিয়েছিল। কাজেই প্রতিশ্রুত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল প্রশাসনিক কাজকর্মের যথোপযুক্ত মানোন্নয়ন। এজন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না প্রশাসনিক কাঠামো বদলের অথবা নতুন করে নিয়ম প্রণয়নের। প্রয়োজন ছিল শুধু দৃঢ়তার, শুধু শক্ত হাতে হাল ধরার। অর্থাৎ, নিজেরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে মন্ত্রীরা যদি সরকারি কর্মচারীদের বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে তাঁরা স্তাবকতা বা সরকারের স্তুতি চান না, তাঁরা চান দ্রুতগতিতে কাজ আর জন-পরিষেবায় আন্তরিক মনোনিবেশ এবং সরকার তথা দলকে সমর্থনের দোহাই দিয়ে সরকারি কর্মীদের কর্তব্যকর্মে অবহেলা তাঁরা আদৌ বরদাস্ত করবেন না তাহলে প্রশাসন নিঃসন্দেহে অতি দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে অতীতের মতো এখনও বামফ্রন্ট সরকার সরকারি কর্মচারী সংগঠনকে তার সংগ্রামের বন্ধু অথাৎ তার প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ানোর অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করতে থাকে। ফলে কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় না করে তাঁদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বাড়িয়ে তাঁদের প্রশ্রয় দেওয়া আর সন্তুষ্ট রাখাই লক্ষ্য হয় সরকারের অন্যদিকে কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যায় নিজের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কর্মচারী সংগঠন তাঁদের সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু তাঁরা যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন কিনা সে বিষয়ে তদারকি করা এই সংগঠন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে।

এইভাবেই ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অন্তত একজন মন্ত্রী এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকারের একটি ন্যূনতমম বিপ্লবী চরিত্র বজায় থাকুক,এই সরকার সরকারি কাজকর্মকে কেন্দ্র করে চুরি-জোচ্চুরি ও ঘুষ খাওয়া বন্ধ করতে উদ্যোগী হোক এবং গুণাগুণ বিচার না করে রাজনীতির স্বার্থে পাইয়ে দেওয়া বন্ধ হোক এই মন্ত্রীর নাম অশোক মিত্র। বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ

বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে জিতে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি তিনি বন্ধ করতে পারেননি। কারণ এ বিষয়ে তিনি দলের কাছ থেকে কোনও সমর্থন পাননি, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি। তাই শেষ পর্যন্ত এই ইস্যুতেই তাঁকে মন্ত্রিপদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার চলাকালীন তিনি মন্ত্রিপদ ছেড়ে দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে কাজ শুরু করার আগেই কাজ না করার অজুহাত দিতে থাকে জোর গলায়। যেমন গোড়া থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য সি পি আই(এম) নেতা বারবার জনসমক্ষে তিরিশ বছরের কংগ্রেসি অপশাসনের কথা বলতে থাকেন। এর নিহিতার্থ ছিল এই যে তিরিশ বছরে কংগ্রেসি শাসন পশ্চিমবঙ্গের এমনই সর্বনাশ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সহজসাধ্য নয় এবং তা সময়সাপেক্ষও। এই বক্তব্য যেমন সত্য ছিল তেমনই মিথ্যাও ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের যাত্রারম্ভের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেসি শাসন যে পশ্চিমবঙ্গের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৬২-৬৭ পর্বে প্রফুল্ল সেনের শাসন পুরোপুরি অপশাসন ছিল এই মূল্যায়ন তর্কসাপেক্ষ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রফুল্ল সেনের সরকার বাঙালি জীবনে গতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এই পর্বের কংগ্রেসি শাসন পশ্চিমবঙ্গের চরম সর্বনাশ করেছিল। আবার বিধান রায়ের চোদ্দ বছরের রাজ্য শাসনকে অপশাসন হিসাবে চিহ্নিত করাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতপক্ষে, বামফ্রন্ট শাসনের কুড়ি বছর পরে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিধান রায়কে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির প্রাণপুরুষ হিসাবে প্রশস্তি জানিয়ে থাকেন, অথচ সেদিন কিন্তু তাঁরা সকলেই তিরিশ বছরের কংগ্রেসি অপশাসনের ঐতিহাসিক সত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

আসলে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা সি পিআই(এম)-এর ছিল না। সে চেয়েছিল মূলত সেই ধরনের (কর্মসূচি নিয়ে এগোতে যাতে তার রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা প্রবলতর হবে এবং রাজ্যের যতটুকু উন্নয়ন হবে তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নয়ন ও উপকার যেন হয় দলের ও দলীয় স্বার্থের। বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের নৈতিক কর্তব্য ছিল সিপিআই(এম)-কে বোঝানো যে উদার, দল-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করলে বামফ্রন্টের সপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনের কোনও অভাব হবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু সংগঠনে ও শক্তিতে সি পি আই(এম) ছিল এতই বৃহৎ এবং অন্যান্য শরিকেরা

এতই ক্ষুদ্র যে সি পি আই(এম)-কে জোর দিয়ে কোনও কথা বলার বা পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না এবং কুড়ি বছর ধরেই এই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্টের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি দলিল প্রণয়ন। সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে নির্মিত এই দলিল বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে ১৯৭৭ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে এবং তারপর এর কপি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়। দলিলে বেশ কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল যেগুলির লক্ষ্য ছিল রাজ্যকে অনেক বেশি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া। অতঃপর সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের আওয়াজ তোলা হয় এবং ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে এলে এই দাবি অনেক বেশি জোরদার করা হয়। তবে এই দাবি আদায়ের ব্যাপারে সিপিআই(এম) যে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল না এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত দলিলটিকে সে যে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা হিসাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেসি সরকারের ওপর চাপ দিয়ে এই দাবি আদায় সহজতর হওয়া সত্ত্বেও সি পি আই(এম) সে সময় এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত উদ্যোগ নেয়নি এবং এই দাবিটিকে ইস্যু করে দেশ জুড়ে কোনও আন্দোলন করারও চেষ্টা করেনি। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে দলিলটি তৈরি করার কুড়ি বছর পরে যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই দলিলে সন্নিবিষ্ট প্রস্তাবাদি বাস্তবে রূপায়ণের পক্ষে ছিল যথেষ্ট অনুকূল এবং কেন্দ্রে যখন আসীন ছিল সি পি আই(এম)-এর বন্ধু সরকার তখন কিন্তু সি পি আই(এম) মহলে এই দলিল কার্যত বিস্মৃত হয় এবং এ নিয়ে সি পি আই(এম) নেতৃবর্গের কণ্ঠে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় না।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের প্রথম বারো বছরে সি পি আই(এম) এর স্লোগানে ও দেওয়াল লিখনে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের দাবিই ছিল প্রধান ইস্যু। বলা বাহুল্য, এতে নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল সি পি আই(এম)। যেমন, এই ইস্যুকে সামনে রেখে সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতা আড়াল করার সুযোগ ছিল, অর্থাৎ সি পি আই(এম) অনায়াসেই রাজ্যবাসীকে এই অজুহাত দিতে পারত যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া না হলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সদর্থক কিছু করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সংসদীয় গণতন্ত্রের অংশভাক হয়েও যে সিপিআই(এম) তার বিপ্লবী চরিত্র হারায়নি, অর্থাৎ, সংগ্রাম-সংঘাতের পথ যে সে ছাড়েনি জনসমক্ষে তা প্রমাণ করার জন্য সি পি আই(এম)-এর কাছে এই ইস্যুর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল যেহেতু রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবি তুলে সে সকলকে অন্ততপক্ষে দেখাতে পারত যে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে যেতে সে সততই প্রস্তুত। তৃতীয়ত, ১৯৭৭-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

অর্জন করেও সি পি আই(এম)-এর আশঙ্কা ছিল যে কংগ্রেস যদি কেন্দ্রে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতাসীন হলে এই ভয় স্বভাবতই বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে সি পি আই(এম) রাজ্যের স্বাতন্ত্রের দাবিতে নতুন করে শোরগোল তাহলে যাতে কেন্দ্র রাজ্যের লড়াকু সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সাহস না পায়। বলা বাহুল্য, এই অবস্থান নিয়ে সুফলই পায় সি পি আই(এম) ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় ফিরে ইন্দিরা গান্ধী নটি রাজ্যের অকংগ্রেসি সরকারকে পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অব্যাহতি পায় শুধু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার।

ইতিমধ্যে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাতে অনেকেই প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে দণ্ডকারণ্য থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং তাঁদের একটা বড় অংশ আশ্রয় নেন দক্ষিণবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে। এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে মরিচঝাঁপিতে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ ছিল অতিরিক্ত আর্থিক দায়ভার বহন করা যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু এই বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নৈতিক দায়িত্বও যে ছিল সে কথাও অস্বীকার করা যায় । তা ছাড়া দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে খুব সুখেই ছিলেন এবং মরিচঝাঁপিতে তাঁরা এসেছিলেন নেহাতই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে জব্দ করতে একথা ভাবারও কোনও কারণ নেই। কাজেই মানবিক কারণেও রাজ্য সরকারের তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ছিল। আরও উল্লেখ্য যে পঞ্চাশের দশকে বিধানচন্দ্র রায় যখন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের আন্দামান ও দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন তার প্রবল বিরোধিতা করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। জ্যোতি বসু প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ তখন ধুবুলিয়া, রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, রূপশ্রী পল্লী উদ্বাস্তু শিবির প্রভৃতি এলাকায় এই প্রচার করেন যে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সব উদ্বাস্তুর পুনবাসন সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের প্রহসন এই যে, অতীতে যে কমিউনিস্টরা এই কথা বলেছিলেন এবং উদ্বাস্তুদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদেরই সরকার শেষ পর্যন্ত মরিচঝাঁপিকে উদ্বাস্তুমুক্ত করতে বলপ্রয়োগ করে এবং পুলিসি নিগ্রহে বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। এবংবিধ ঘটনা অবশ্যই বামফ্রন্ট সরকারের মুখোজ্জ্বল করেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ তখন বামফ্রন্ট সরকারের নেই। কারণ সরকার তখন সবিশেষ ব্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আয়োজনে।

বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের ৪ জুন। এর আগে কংগ্রেসি জমানায় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পনেরো বছর ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই

বামফ্রন্টের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ছিল এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ। কেউ কেউ মনে করেন যে এই উদ্যোগের পিছনে কাজ করেছিল সি পি আই(এম)-এর স্বার্থপ্রণোদিত রাজনৈতিক কৌশল। তাঁদের মতে, সি পি আই(এম) বাহ্যত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে ও গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় বিশেষ আগ্রহী হলেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করে নিজের অনুকূলে ব্যাপক গ্রামীণ সমর্থনের ভিতটিকে পাক্তো করে তোলা। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ সি পি আই(এম) সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে ও নিখুঁত পরিকল্পনা ছকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল তথ্যাদি থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের উদ্যোগ সি পি আই(এম) নেয়নি, নিয়েছিলেন আর এস পি সদস্য ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সি পি আই(এম) যদি তখন পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকত তাহলে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত দপ্তরটি সে কখনই আর এস পি-কে ছেড়ে দিত না। দপ্তর বন্টন করতে গিয়ে আর বিশেষ কোনও দপ্তর পড়ে না থাকায় পঞ্চায়েত দপ্তর দেওয়া হয় দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী হয়েই দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সত্বর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ না করলেও শেষ পর্যন্ত দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সায় দেন।

এই নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ মিলিয়ে মোট আসন সংখ্যা ছিল ছাপান্ন হাজার। এর মধ্যে সি পি আই(এম) একাই দখল করে ৩৪,১৮৯টি আসন এবং কংগ্রেসের মোট প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ছিল ৫,১৭৭টি। অর্থাৎ, সি পি আই(এম) পায় ৬১ শতাংশ আসন আর কংগ্রেস পায় মাত্র ৯.২৫ শতাংশ। আসন। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সমর্থন ব্যবস্থা ধসে পড়েছে আর সি পি আই(এম) প্রভূত প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। প্রথম পঞ্চায়েতনির্বাচনে এই বিপুল সাফল্য থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিতে সিপিআই(এম) দেরি করেনি। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের ৮০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলের সে কারণে সে বুঝে নেয় যে ভবিষ্যতে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল গ্রামাঞ্চলে নিজের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং এই প্রাধান্যের পরিসর আরও বাড়ানো। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসাবে এখন থেকে সে নির্ভর করতে থাকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই নির্বাচন করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী না হলেও নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সি পি আই(এম) শুরু করে তার পঞ্চায়েতকেন্দ্রিক রাজনীতি। পরবর্তী কুড়ি বছরে সি পি আই(এম) এই রাজনীতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে পারেনি এবং পরিণামে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তার ভূমিকা ক্রমশ খাটো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু শিল্পশ্রমিক

শ্রেণীর তুলনায় গ্রামাঞ্চলের সমর্থক বাহিনীর সংখ্যা বিপুল সে কারণে ভোটের রাজনীতিতে সে স্বভাবতই লাভবান হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ১৯৭৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এক ভয়াবহ বন্যা হয় পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের বারোটি জেলার প্রায় দেড় কোটি মানুষ এই বন্যায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন। বন্যায় প্রাণ হারান প্রায় বারোশ মানুষ এবং বহু কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে বন্যাত্রাণের কাজে খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে বামফ্রন্ট তথা সি পি আই(এম)-এর পঞ্চায়েতগুলি। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় পঞ্চায়েতকে এবং এ নিয়ে অনেকে দলবাজির অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগ সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, ঘটনা এই যে রাজনৈতিক বিচারে (১৯৭৮-এর বন্যা সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্টের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। কারণ বন্যাকবলিত ব্যক্তিদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য শুরু করা বিভিন্ন প্রকল্প খাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুদান দেয় এবং এই টাকার সবটাই গ্রামের মানুষের মধ্যে বিতরিত হতে থাকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। এতদ্বারা সি পি আই(এম) নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের মানুষের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায় এবং ফলত রাজনৈতিকভাবে সবিশেষ উপকৃত হয় সি পি আই(এম)। মতাদর্শের মাধ্যমে নয়, কেন্দ্রের দেওয়া টাকা দিয়ে ভোট সংগ্রহের সূত্রপাত এখান থেকেই।

প্রথম দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা

গ্রামীণ ভোটার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ও যত্নশীল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। যেমন ক্ষুদ্র চাষীদের স্বার্থরক্ষার্থে সেচ এলাকায় চার একর এবং অসেচ এলাকায় ছয় একর পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মকুব করা হয়। এছাড়া অতীতের মতো লাঠি-সড়কি সহ জোর করে জমিতে লাল ঝাণ্ডা পুঁতে নয়, বিধিবদ্ধ উপায়ে ও শান্তিপূর্ণভাবেই সিলিং বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ করা হতেথাকে এবং এই অধিগৃহীত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হতে থাকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। তবে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয় ১৯৭৯ সালে এবং জেলায় জেলায় এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে দেখা যায় যে প্রায় চোদ্দ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এতদ্বারা রাজ্যে ব্যাপকভাবে কৃষি জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাশাপাশি প্রথম বামফ্রন্ট সরকার বর্গা' আইন সংশোধন করে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করে। অতঃপর কয়েক বছর ধরে দরাজ হাতে কৃষি ঋণ বাবদ কাঁচা টাকা দেওয়া হতে থাকে বর্গাদারদের। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বামফ্রন্ট সম্পর্কে এক বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং তাঁরা সকলেই বামফ্রন্ট সরকারকে গরিবের বন্ধু হিসাবে গণ্য করতে থাকেন।

অন্যদিকে কৃষি জমিতে বর্গাদারদের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্গাদারদের পরিবারের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য অধিকার-সচেতন হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক চেতনাও বাড়ে। আবার উচ্ছেদের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে অধিকতর উদ্যোগী হওয়াও সম্ভব হয় বর্গাদারদের পক্ষে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবনে সর্বপ্রথম এক নতুন বাতাবরণ তৈরি হয় এবং এ ছিল, নিঃসন্দেহে, বামফ্রন্ট সরকারের এক বড় কীর্তি।

পাশাপাশি প্রথম বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের বেতনকাঠামো পরিবর্তন করে নতুন বেতনক্রম চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন তৈরি করা হয়। কয়েক হাজার প্রাথমিক স্কুল, শতাধিক মাধ্যমিক স্কুল ও কয়েকটি কলেজ স্থাপন করা হয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়। আরও উল্লেখ্য যে প্রথম পাঁচ বছরে শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বাড়ানো হয় তিন গুণ। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বামফ্রন্ট সরকারের এইসব পদক্ষেপ ছিল

নিঃসন্দেহে ভাল কাজের সূচক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও ক্ষেত্রেই সরকার দল-নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেনি।

বস্তুত, সরকারের প্রধান শরিক সি পি আই(এম) এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে দলের আধিপত্য বিস্তার করা এবং বিরোধী রাজনীতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ায় এই লক্ষ্যে সে পৌঁছাতে পেরেছিল নির্বিঘ্নে। গোড়া থেকেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নয়, দলের শ্রীবৃদ্ধিই ছিল সি পি আই(এম)-এর লক্ষ্য এবং বিধানসভায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এই লক্ষ্যপূরণে সে এগোতে পেরেছিল বেপরোয়াভাবে, কারুর কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অত্যন্ত কর্মদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিনা নোটিশে গৃহভৃত্যের মতো বরখাস্ত করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে ও অন্যান্য সংস্থায় প্রধান হিসাবে যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও বাছ-বিচার না করে বসাতে শুরু করে পার্টির সদস্য বা সমর্থকদের, পুলিশ বিভাগ তথা বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরকে চালাতে থাকে দলীয় স্বার্থে এবং কসবায় প্রকাশ্যে সতেরোজন আনন্দমার্গীকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হলেও সরকার তথা পার্টিকে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন থাকতে দেখা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে পার্টি ও সরকার যখন এইভাবে এগোচ্ছে তখন তাকে সতর্ক ও সংযত করার কেউ নেই। প্রধান বিরোধী দল রাজ্য কংগ্রেস তখন সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ। ১৯৭৭-এর সংসদীয় নির্বাচনে চরম বিপর্যয়ের পর ইন্দিরা গান্ধী যখন শাহ কমিশনের সামনে কৈফিয়ত দিতে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান তখন সিদ্ধার্থ রায় নিজের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত এবং স্বভাবতই রাজ্য কংগ্রেসের পুনরুত্থান নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই। আবার ১৯৭৮ সালে সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় ভাঙন ঘটে তার প্রভাবেও রাজ্য কংগ্রেস দিশেহারা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া পাঁচ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সিদ্ধার্থ রায় রাজ্য কংগ্রেসে যে গোষ্ঠী রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন ১৯৭৭-এর নির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পর থেকে তা চরম আকার ধারণ করে। দল ভাগ হয়ে যায় অনেকগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী নেতাই এখন সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার খোয়াব দেখতে থাকেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ এই দলের পক্ষে বিরোধী দলের যথাযযাগ্য ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই নামরক্ষার জন্য একটি দুটি বন্ধ ডাকা আর বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না।

সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের কোনও দিনই কোনও পোক্ত সংগঠন ছিল না। বামফ্রন্ট জমানায় পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম)কে বিপুল সাংগঠনিক বিস্তার ঘটাতে দেখেও সে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রামাঞ্চল অনায়াসে চলে যায় সি পি আই(এম)-এর দখলদারিতে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী মহলেও ছিল নীরবতা। তাঁরা যে সোৎসাহে সব কিছু মেনে নিতে পেরেছিলেন এমন নয়। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ দেখে তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন যে সরকার তথা সরকারের মুখ্য শরিক সি পি আই(এম)-কে তুষ্ট রাখতে পারলে ভালরকম প্রাপ্তিযোগ ঘটবে আর তাদের সম্পর্কে অপ্রিয় সত্য কথা বললে অথবা বিরোধিতা করলে অনেক কিছু হারাতে হবে শুধু তাই নয়, ন্যায্য পাওনা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আত্মস্বার্থের তাড়নায় তাঁদের কেউ কেউ নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়স্কর বলে মনে করেন আর বাকি সকলে পাওয়ার আশায় দলে দলে ভিড় করতে থাকেন পার্টির ছাতার তলায়। এই পরিস্থিতিতে আশ্চর্য নয় যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে সি পি আই(এম) নিয়ন্ত্রিত যে কৃষকসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,১১,৫২৮, তিন বছরের মধ্যে তা বেড়ে হয় ৩১,১২,৯৬৫ এবং সি পি আই(এম)-এর যে পার্টি সদস্য সংখ্যা ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ছিল মাত্র তেত্রিশ হাজার চার বছরের মধ্যে তা বেড়ে হয় প্রায় পঁচাশি হাজার।

এই প্রেক্ষাপটে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার চলাকালীন ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হয় লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস(ই) জয়ী হলেও পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পায় ৩৮টি আসন এবং কংগ্রেস মাত্র ৪টি আসন। ৪টি আসন পেলেও ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে কংগ্রেসের অনুকূলে অনেক বেশি ভোট পড়ে। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট পায় ৫২ শতাংশের কিছু বেশি ভোট, সি পি আই(এম) এককভাবে পায় ৪০ শতাংশ এবং কংগ্রেস পায় প্রায় ৩৭ শতাংশ। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ১৯৭৭-এর দুটি নির্বাচনে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে পর্যদস্ত হলেও এই নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের হারের বিচারে সে পুরানো জায়গায় ফিরে এসেছে এবং সি পি আই(এম)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেলেও কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে সে ভাঙন ধরাতে পারেনি। লোকসভা নির্বাচনের এক বছর পরে ১৯৮১ সালের ৩১শে মে রাজ্যের ৮৬টি পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দূরদৃষ্টিহীন এবং বামফ্রন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলায় অক্ষম রাজ্য কংগ্রেস এই নির্বাচন বন্ধ রাখার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়। অবশেষে আদালতের রায় তার বিরুদ্ধে গেলে কংগ্রেস নির্বাচন বয়কট করে যদিও বেশ কিছু কংগ্রেস সদস্য নির্দল প্রার্থী হিসাবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত

হলে দেখা যায় যে ৬৮ টি পুরসভায় বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এইভাবেই কংগ্রেসের চরম নিষ্ক্রিয়তায় শহরাঞ্চলের ভোটও তার হাতছাড়া হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতেই ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচন বন্ধ করার জন্যও কংগ্রেস আদালতের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়েই নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে ফলাফল কী হবে তা ছিল সহজেই অনুমেয়। অপারেশন বর্গা , পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও ঋণ অনুদানের দরাজ ব্যবস্থার কল্যাণে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ এখন সর্বতোভাবেই সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্টের উৎসাহী সমর্থক। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকলে তাদের পরম মঙ্গল আর না থাকলে তাদের চরম সর্বনাশ -এমন একটা ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে প্রলুব্ধ সঙ্গত কারণেই তাঁদের অনেকেই এখন সিপিআই(এম)-এর উঠতি নেতা বা কর্মী এবং তাঁদের দাপটও ধীরে ধীরে বাড়ছে। অন্যদিকে সম্পন্ন জোতদার ও ভূস্বামী শ্রেণী এখন গ্রামজীবনে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে দেখে খুবই সন্ত্রস্ত। অতীতের মতো ভোটের খবরদারি করার সাহস বা ক্ষমতা তাঁদের নেই। শহরাঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই ছোট ছোট স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসক দলের কাছে আত্মবিক্রয়ে ব্যস্ত। আর পরিবর্ত শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এই দলের নেতারা সদর দপ্তরে বসে বিবৃতি দেন, কখনও কখনও বনধ ডাকেন এবং কর্মীদের দিয়ে কলকাতা মহানগরীতে দু চারটে ট্রাম বাস পোড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা গ্রামে গিয়ে সংগঠন গড়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না এবং সামগ্রিকভাবে সি পিআই(এম)-এর সঙ্গে রাজনৈতিক পাল্লা দেওয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনওটাই তাঁদের নেই। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসী যে ভরসা করে তাঁদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেবেন না এটাই স্বাভাবিক এবং ১৯৮২-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে ঠিক এই জিনিসটাই প্রতিফলিত হয়।

এই নির্বাচনে ১৯৭৭ সালের মতোই বামফ্রন্ট তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭৭-এর তুলনায় ৭টি আসন বেশি পেয়ে এবার মোট ২৩৮টি আসন দখল করে এবং সি পি আই(এম) ১৭৪টি আসন পেয়ে আগের মতোই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। পক্ষান্তরে কংগ্রেস(ই) পায় ৪৯টি আসন, কংগ্রেস(স) পায় ৪টি আসন এবং জনতা পার্টি নির্বাচনে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কংগ্রেস(ই) ও কংগ্রেস(স)-এর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল সম্মিলিতভাবে প্রায় ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ, কংগ্রেস নিতান্ত শক্তিহীন হলেও ১৯৮০ সালের মতোই তার নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক অটুট থাকে। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ছিল অধিকতর ঐক্যবদ্ধ কারণ এখন সি পি আই ছিল ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত। ফলে বাম ভোট ভাগ হওয়ার অবকাশ ছিল অনেক কম এবং অন্য দিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি ও সক্রিয়তা ছিল নগণ্য। তথাপি কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে বামফ্রন্ট ভাঙন

ধরাতে পারেনি। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাজ্য কংগ্রেস যত অপদার্থই হোক না কেন, তার অনুকূলে রাজ্যবাসীর একাংশের সমর্থন প্রবাহিত হবেই। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট ছাড়া বাকি দলগুলির সংসদীয় শক্তি প্রায় শূন্যে পৌঁছে যাওয়ায় এ-ও প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে মেরুভবন(polarisation) দেখা দিয়েছে এবং পরবর্তী সব নির্বাচনেই এই মেরুভবন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৮২-এর বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কে আরও লক্ষণীয় এই যে এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ১৯৭৭-এর মতো নেতিবাচক ভোটে বিজয়ী হয়নি, হয়েছিল ইতিবাচক ভোটের ভিত্তিতে। তবে শহরাঞ্চলের বেশ কিছু আসন এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের ছজন মন্ত্রী পরাজিত হন।

১৯৮২-এর নির্বাচনে ইতিবাচক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর অনেকেই আশা করেছিলেন যে এবার বামফ্রন্ট সরকার দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে রাজ্য গড়ার কাজে মন দেবে। কারণ গ্রামীণ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে বামফ্রন্ট, বিশেষত সি পি আই(এম)-এর অনুকূলে তা এই নির্বাচনে প্রমাণিত। তাছাড়া কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করবে না তা-ও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব রাজনৈতিকভাবে সি পি আই(এম) এবং বামফ্রন্ট এখন খুবই নিশ্চিন্ত। ইতিমধ্যে ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিন স্তর মিলিয়ে বামফ্রন্ট মোট ৩৪,৩৫৫টি আসন দখল করে আবার বিপুলভাবে জয়ী হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকারের নিশ্চিন্ত হওয়ার অবকাশ আরও বেড়ে যায়। কাজেইসর্বশক্তি দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করার মতো উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ যে এখন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করলে সি পি আই(এম) রাজ্য জুড়ে তার আধিপত্যের দুর্গটিকে নিচ্ছিদ্র করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বভাবতই আমাদের লোক হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করতে থাকেন এবং কর্মদক্ষতা দেখিয়ে সুনাম অর্জন করার চেয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে রাজনৈতিক কর্তাদের খুশি করাই তাঁদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে সর্বস্তরেই, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, সি পি আই(এম) কর্মীরা চরম দাপট দেখাতে থাকেন। এই নবোদ্ভূত রাজনৈতিক এলিটরাই হয়ে ওঠেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এলাকায় এলাকায় তারাই হন সমাজজীবনের নিয়ন্তা এবং স্থানীয় পুলিস ও প্রশাসন চলতে থাকে তাঁদেরই নির্দেশে। শুধু ক্ষমতাবানই নয়, তাঁরা বিত্তবানও হতে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে দেখা যেতে থাকে যে, এলাকার যে দাপুটে রাজনৈতিক কর্মীটি নিতান্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন ১৯৭৭ সালে, দশ বছরের মধ্যে তিনি পাকা দালান তুলে ফেলেছেন এবং সাইকেল ছেড়ে স্কুটার বা মোটরবাইক চড়ছেন। এসব দেখে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ অনায়াসেই উপলব্ধি করতে থাকেন যে

সাহায্য বা অনুদান হিসাবে যে টাকাটা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তা তাঁদের প্রাপ্য টাকার সবটা নয় এবং এর একটা অংশ চোরাপথে চলে গেছে অন্যত্র। তথাপি তাঁদের নীরব থাকতে হয় কারণ তাঁরা জানেন যে মুখ ফুটে সত্য কথা বলার চেষ্টা করলে তাঁদের ঘরবাড়ি, ক্ষেতের ফসল অক্ষুন্ন থাকবে না, এমনকি সামাজিক বয়কটেরও শিকার হতে হবে। শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ কিন্তু ধীরে ধীরে সরকারের সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন, ট্রামে-বাসে ট্রেনে তাঁদের আলাপ-আলোচনায় আর সরকারের সাধুবাদ শোনা যাচ্ছে না। তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে কারণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে বিদ্যুৎ মন্ত্রক বারবার হাত বদল করেও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কোনও স্থায়ী উন্নতি হচ্ছে না। আরও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭ সাল থেকে দশ বছরের মধ্যে রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের সংখ্যায় এবং নথিভূক্ত বেকারের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানে এসে পৌঁছেছে, দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে বাস করলেও সারা দেশের মোট নথিভুক্ত বেকারদের ১৬ শতাংশ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং এ-ও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭ সাল থেকে ভারতবর্ষে শিল্প উৎপাদন যে হারে বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ আর সাধারণ মানুষের অবগতির বাইরে যে ঘটনা ঘটছে তা হল এই যে ষষ্ঠ পরিকল্পনাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে ৩৫০০ কোটি টাকা পরিকল্পনা ব্যয় করার অনুমোদন দেওয়া হয় কর্মতৎপর বামফ্রন্ট সরকার তার মাত্র ৬৬ শতাংশ খরচ করতে পারে। অন্যদিকে কর বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের প্রায় সবটাই বামফ্রন্ট সরকার নিঃশেষ করে ফেলেছে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং নানা পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ে।

এসব কিছুর অর্থ এই যে বামফ্রন্ট শাসনের দশ বছরের মধ্যেই উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ খুবই পিছিয়ে পড়ে এবং এর ফলে বাঙালি সমাজজীবনে তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। কিন্তু এই সঙ্কটের কোনও আভাসই ছিল না সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্টের নেতৃবর্গের ভাষণেবিবৃতিতে। তাঁরা নিজেদের সাফল্যের ফিরিস্তি দিয়ে নির্বাচন জিততে ব্যস্ত (যদিও ১৯৮৪-এর হাওড়া কর্পোরেশন নির্বাচনে এবং ১৯৮৫-এর কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে কোনও মতে কান ঘেঁষে জিতে বামফ্রন্ট তার মান রক্ষা করে)। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের সাফল্যের উজ্জ্বল নিদর্শন হল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, নন্দন প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি নির্মাণ, পার্টি অফিসগুলিকে বাণিজ্যিক সংস্থার আদলে ঝকঝকে করে তোলা, পদযাত্রা করে ও বামফ্রন্টের নামে স্লোগান দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা, কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা এবং শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ অর্থের ২৫ শতাংশ ব্যয় করা, যদিও এই ব্যয়ের প্রায় সবটাই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মাইনে বাবদ, শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন বাবদ নয়। এইসব সাফল্যের সুবাদে বাম নেতৃবর্গের আত্মশ্লাঘা যখন স্ফীত হচ্ছে তখনই এক অঘটন ঘটে ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে।

দশম বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও পরিণাম

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের দুমাস পরে ১৯৮৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় দশম লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস লোকসভার চার-পঞ্চমাংশ আসন লাভ করে সর্বকালীন রেকর্ড করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই নির্বাচনে কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে এবং বামফ্রন্টের জয়যাত্রা ব্যাহত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস পায় ১৬টি আসন এবং বামফ্রন্ট পায় ২৬টি আসন। সি পি আই(এম) নিজে পায় ১৮টি আসন এবং ৩৫.৯ শতাংশ ভোট। ১৩টি আসনে সে পরাজিত হয়। পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন অনেক বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কংগ্রেস পায় ৪৮.২ শতাংশ ভোট এবং তার বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন সদ্য রাজনীতিতে আসা তরুণ নেতা ও নেত্রী। বামপন্থীরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের এই অভূতপূর্ব সাফল্যকে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কিত সহানুভূতি ভোটের পরিণাম হিসাবে গণ্য করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও তাঁদের মূল্যায়ন ছিল অনুরূপ।

তবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ভাল ফল করেছিল শুধু ইন্দিরা হাওয়ার কারণে নয়, অন্য কারণও ছিল। মনে রাখতে হবে যে এই নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল করেছিল রাজ্যের সর্বত্র নয়, শুধু কলকাতা, শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলে। শুধু সহানুভূতি ভোটই যদি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাফল্যের কারণ হত তাহলে গ্রামাঞ্চলেও কংগ্রেস যথেষ্ট ভাল ফল করত যেহেতু গ্রামের ভোটার শহরাঞ্চলের ভোটারদের তুলনায় অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। কিন্তু বামফ্রন্ট ধাক্কা খেয়েছিল মূলত শহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার চলাকালীন শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বামফ্রন্ট সম্পর্কে বিরূপতা দেখা দিতে শুরু করে এবং এই সময়ে কলকারখানা দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বা রুগ্ন হয়ে পড়ায় বিপন্ন শিল্পশ্রমিকদের বামফ্রন্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও ছিল স্বাভাবিক। কাজেই ১৯৮৪-এর লোকসভা নির্বাচনে শুধু ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে নয়, বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়েও পশ্চিমবঙ্গের অনেকে ভোট দিয়েছিলেন কংগ্রেসের পক্ষে।

এই লোকসভা নির্বাচনের ছমাসের মধ্যে ১৯৮৫ সালের ৩০ শে জুন কলকাতা কর্পোরেশনের যে নির্বাচন হয় তার ফলাফলেও নগরবাসীর বামফ্রন্ট সম্পর্কে বিরূপতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে কংগ্রেস এই নিবার্চন লড়ে বামফ্রন্টের প্রায় সমানসংখ্যক আসন দখল করে। বস্তুত, পরিস্থিতি তখন এমনই জটিল হয়ে পড়ে যে, বামফ্রন্টকে ঘুরপথে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা দখল করতে হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে সি পি আই(এম)-এর চরম দলবাজি জনসমক্ষে নগ্নভাবে প্রকট হতে থাকে এবং রাজ্যের দলনিরপেক্ষ শিক্ষিত শ্রেণী এতে ক্ষুব্ধ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে প্রার্থী মনােনয়নের জন্য সিনেটে যে ভোটাভুটি হয় তাতে বামফ্রন্ট প্রার্থী এবং কার্যত সি পি আই(এম) প্রার্থী এবং বিদায়ী উপাচার্য রমেন পোদ্দার সর্বোচ্চ ভোট পেতে ব্যর্থ হন, সর্বোচ্চ ভোট পান আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তোষ ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক অসর্কতার জন্যই বামফ্রন্টের এই হার হয়। শোনা যায় যে প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে সি পি আই(এম) একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বামফ্রন্টের ক্ষুব্ধ শরিকদের কেউ কেউ ইচ্ছে করেই রমেন পোদ্দারের পক্ষে ভোট দেননি। ভাটে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সি পি আই(এম) রমেন পোদ্দারের পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে মরিয়া হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মার কাছে সন্তোষ ভট্টাচার্যের সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ার ঘটনার উল্লেখ না করেই সিনেটের নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা পাঠানো হয়। রাজ্যপাল শর্মা অবশ্য সি পি আই(এম)-এর পছন্দের প্রার্থী রমেন পোদ্দারকে উপাচার্য পদে নিয়োগ না করে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করেন। অতঃপর সি পি আই(এম)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৈবগতিকে কেউ যদি সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে বসেন তাহলে তাঁর ভাগ্যে কী বিড়ম্বনা জোটে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকেন রাজ্যবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সি পি আই(এম) নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী সংগঠন দিনের পর দিন আন্দোলন চালাতে থাকে উ পাচার্যের বিরুদ্ধে এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই উপাচার্যের চরম হেনস্থা হতে থাকে। রাজ্যের শিক্ষিত শ্রেণী, বিশেষত কলকাতা নগরীর দলনিরপেক্ষ বিদ্বৎসমাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হতে দেখে বামফ্রন্টের ওপর রুষ্ট হন।

পরিস্থিতি যখন এইভাবে বামফ্রন্টের বিপক্ষে যাচ্ছে তখন তার সবটুকু সুবিধা আদায়ের জন্য যথাােপযুক্তভাবে সক্রিয় না হয়ে রাজ্য কংগ্রেস আত্মকলহে ও আত্মসন্তুষ্টিতে মগ্ন। রাজ্য কংগ্রেসের ছাােট-মাঝারি-বড় মাপের প্রত্যেক নেতাই তখন নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যাােগ্য বলে মনে করছেন এবং তাঁরা আরও মনে করছেন যে কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যুক্ত কংগ্রেসি শাসন রাজ্যস্তরে তাঁদের

আপনাআপনিই ক্ষমতার দোরগড়ায় পৌঁছে দেবে। অন্যদিকে বিচক্ষণ সি পি আই(এম) অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফল করতে দেখে অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে পড়েছে এবং এই ইতিহাসের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা সুনিশ্চিত করতে সে সবদিক থেকেই অত্যন্ত সক্রিয়) ১৯৮৬ সালের ১৫ জুন ৭৫টি পুরসভার যে নির্বাচন হয়, বলা বাহুল্য, তাতে এই সক্রিয়তার সুফল পাওয়া যায়। অধিকাংশ পুরসভাই দখল করে বামফ্রন্ট।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দশম বিধানসভা নির্বাচনের বাজনা বেজে ওঠে। উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়েই সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্ট এই নির্বাচনে নামে। যেমন এই নির্বাচনের প্রচারাভিযানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে এক উজ্জ্বল ও প্রতিশ্রুতিময় ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরতে সি পি আই(এম) বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে এবং এই প্রতিশ্রুতিময় ছবিটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যৌথ উদ্যোগে সদ্য আরব্ধ হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের কথা বারবার বলা হতে থাকে। যৌথ উদ্যোগের এই প্রকল্পটিকে দেখিয়ে সি পি আই(এম) রাজ্যবাসীকে বোঝাতে সচেষ্ট হয় যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে মতাদর্শগত আপস মেনে নিয়ে যৌথ উদ্যোগকে আবাহন করতে সে সতত প্রস্তুত। আরও বলা হতে থাকে যে পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে (যা আজও, অথাৎ ১৯৯৭ সালেও হয়নি) এবং তার অধীনস্থ প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের ইলেকট্রনিক শিল্পের বিকাশ সম্পর্কেও এক গোলাপি ছবি তুলে ধরা হয় নির্বাচনী প্রচারাভিযানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নির্বাচন বামফ্রন্টকে লড়তে হয়েছিল, প্রমোদ দাশগুপ্তকে ছাড়াই। ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর বেজিংয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনাবসান হয় এবং অতঃপর সি পি আই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সরোজ মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে রাজ্য কংগ্রেস তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে রাজীব গান্ধীকে তাঁদের তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। নির্বাচনের প্রচার চালাতে রাজীব গান্ধী তাঁর দলবল নিয়ে ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা করেন এবং দিনেরাতে, এমনকি গভীর রাতেও জনসভা করেন। রাজীব গান্ধীর এই সভাগুলিতে বিপুল জনসমাগম হতে থাকে এবং এতে রাজ্য কংগ্রেস দল তার আসন্ন সাফল্য সম্পর্কে খুবই আশান্বিত হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র পরিচালিত প্রাকনির্বাচনী সমীক্ষাগুলিতেও কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হতে থাকে।

দশম বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ। এই নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে কংগ্রেসের সাফল্য সংক্রান্ত সমস্ত পূর্বাভাসই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে বামফ্রন্ট। এই নির্বাচনে সি পি আই(এম) এবং আর এস পি-

র কিছু বিক্ষুব্ধ সদস্য এক বিকল্প বামশক্তি রূপে কোনও কোনও নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়া কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে নিজেকে উপস্থাপিত করে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে। কিন্তু এই দুই পক্ষই নির্বাচনে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। প্রদত্ত ভোটের ৯২.৪৭ শতাংশই বন্টিত হয় কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মধ্যে। অথাৎ, ১৯৮২-এর বিধানসভা নির্বাচনে যে রাজনৈতিক মেরুভবন(polarisation) স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা-ই পূর্ণতা লাভ করে ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে। এই নির্বাচনে মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৫১টি আসন লাভ করে বামফ্রন্ট তিন-চতুথাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সি পি আই(এম) তার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারা বজায় রেখে ১৮৭টি আসন পায়। অন্যদিকে কংগ্রেস পায় মাত্র ৪০টি আসন। মোট ভোটর ৫২.৯৫ শতাংশ পায় বামফ্রন্ট, ৩৯.২৯ শতাংশ পায় সি পি আই(এম) এবং কংগ্রেস পায় ৪১.৮১ শতাংশ। আরও উল্লেখ্য যে ১৯৮২ সালের তুলনায় এই নির্বাচনে সি পি আই(এম) ১৩টি আসন বেশি পায় আর বামফ্রন্টের দুই প্রধান শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি-র আসনসংখ্যা কমে যায় এবং কংগ্রেস ৯টি আসন কম পায়। সব মিলিয়ে ১৯৬৯,১৯৭৭ ও ১৯৮২-এর নির্বাচনের তুলনায় ১৯৮৭-এর নির্বাচনে সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্টের সাফল্য নতুন রেকর্ড স্পর্শ করে। স্বভাবতই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর বামফ্রন্টের বিজয়োৎসব উপলক্ষে ২৯ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে যে জনসভা আয়োজিত হয় তাতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তীব্র কণ্ঠে ধিক্কার জানান সেইসব প্রচার মাধ্যম ও মতামত সমীক্ষকদের যারা নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের পরাজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

সংবাদপত্রগুলির প্রাক-সমীক্ষায় হয়তো অতিরঞ্জন ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের এত কম সংখ্যক আসনপ্রাপ্তি এবং বামফ্রন্টের তথা সি পি আই(এম)-এর রেকর্ড সংখ্যক আসনপ্রাপ্তি সম্পর্কে সংশয়ের যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। বস্তুতপক্ষে, কোনও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই ১৯৮৭ এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেননি এবং ১৯৮৭ সাল থেকেই বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত নিবার্চনের বৈধতা সম্পর্কে জনমানসে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বামফ্রন্টকে পর্যুদস্ত করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁরা অবশ্যই ছিলেন পক্ষপাতদুষ্ট। কারণ ১৯৭৭ সাল থেকেই রাজ্য কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তি ও তৎপরতার বিচারে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল এবং ১৯৮৭ সালে এই অবস্থায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। কাজেই কংগ্রেস বামফ্রন্টকে হারিয়ে দেবে--এ ছিল নিতান্তই এক অলীক স্বপ্ন। কিন্তু কংগ্রেসের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসন পাওয়াও ছিল অবিশ্বাস্য। ১৯৮৪এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ১১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে। এই সাফল্যের

পিছনে যেমন ইন্দিরা-হাওয়ার অবদান ছিল তেমনই অবদান ছিল শহরাঞ্চলের ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের বামফ্রন্ট সম্পর্কিত বিরূপতার। দু বছর তিন মাস পরে বিধানসভা নির্বাচনের সময় ইন্দিরা-হাওয়া উবে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার এমন কিছু ঐতিহাসিক কাজ করেনি যাতে শহরাঞ্চলের ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের বিরূপতা দূর হতে পারে। বরং এই সময়ের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আরও বেড়েছিল এবং কারখানা বন্ধের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যে নেতিবাচক ভোট কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছিল ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তা প্রবাহিত হওয়ার কথা কংগ্রেসের দিকে। এই যৌক্তিক বিচারের ভিত্তিতে কংগ্রেসের পাওয়া উচিত ছিল ১০০ বা তার কাছাকাছি আসন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৪০টি আসন। দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৮২এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক মেরুভবন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অথাৎ প্রায় সমস্ত ভোটই বন্টিত হয় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে এবং ১৯৮৭-এর নির্বাচনে এই মেরুভবন পূর্ণতা লাভ করে। বামফ্রন্ট সরকার শুরু হওয়ার আগে ১৯৬৯-এর নির্বাচনেও এই ধরনের রাজনৈতিক মেরুভবন দেখা গিয়েছিল। অতএব ১৯৬৯, ১৯৮২ ও ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য থাকাটাই সঙ্গত। কিন্তু নীচের সারণিটি খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে ১৯৮৭-এর ফলাফলে এই সাদৃশ্য নেই।

	১৯৬৯	১৯৮২	১৯৮৭
মোট আসন	২৮০	২৯৪	২৯৪
বামফ্রন্ট(১৯৬৯ তে যুক্তফ্রন্ট)	২১৮	২৩৮	২৫১
কংগ্রেস	৫৫	৪৯	৪০
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার	৪০.০৪%	৩৫.৭১	৪১.৮১%

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৯-এর নির্বাচনে ২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৫৫টি আসন, অর্থাৎ মোট আসন ২৯৪ হলে কংগ্রেস পেত ৫৮টি আসন। অতএব ১৯৮২ ও ১৯৮৭-এর মতো ১৯৬৯তেও আসনসংখ্যা ২৯৪ ছিল অনুমান করে নিলে ১৯৬৯, ১৯৮২ ও ১৯৮৭-এর নিবাচনে কংগ্রেসের

প্রাপ্ত আসনসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৫৮, ৪৯ ও ৪০ এবং ওপরের সারণি অনুযায়ী এই তিন নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ৪০.০৪%, ৩৫.৭১% এবং ৪১.৮১। মনে রাখতে হবে যে এই তিন নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছিল রাজনৈতিক মেরুভবন অর্থাৎ এই তিন নির্বাচনে তৃতীয় পক্ষ কার্যত ছিল না, কংগ্রেস-বিরোধী ভোট গেছে বামফ্রন্টের দিকে আর বামফ্রন্ট-বিরোধী ভোট গেছে কংগ্রেসের দিকে। এমতাবস্থায় কংগ্রেস যদি ৪০.০৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ৫৮ টি আসন এবং ৩৫.৭১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৯টি আসন পায় তাহলে ৪১.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৯৮৭-এর নির্বাচনে কী করে সে ৪০টি আসন পায় কোনওভাবেই তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভোটারের সংখ্যা বিশ্লেষণ করেও ১৯৮৭-এর নির্বাচন সম্পর্কে অনুরূপ এক সংশয় সেদিন দেখা দিয়েছিল অনেকের মনে। ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার সংখ্যায় এক অভূতপূর্ব ও অবোধগম্য বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে। ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটদাতা ছিলেন প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ। ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটি ৫৪ লক্ষে। অর্থাৎ, দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত ভোটদাতার সংখ্যা বাড়ে প্রায় ১ কোটি ৩ লক্ষ। পক্ষান্তরে ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল (লক্ষের হিসাবে) ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ এবং ১৯৮১ সালে এই জনসংখ্যা ছিল (লক্ষের হিসাবে)৫ কোটি ৪৫ লক্ষ। আরও উল্লেখ্য যে ১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.১৭ শতাংশ। এই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ১৯৭৭-এর নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যখন ভোটার তালিকা তৈরি হয় তখন এ রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি এবং ১৯৮৭-এর নির্বাচন উপলক্ষে ভোটার তালিকা যখন সংশোধিত হয় তখন এই জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ কোটি। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে (১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি আর ভোটার সংখ্যাও বেড়েছে ১ কোটি, অর্থাৎ এই দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা জন্মগ্রহণ করা মাত্রই ভোটার হয়েছেন। এই অবিশ্বাস্য ঘটনার সবটাই যে ঘটে ছিল ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রমাণ হল নীচের সারণি।

যে বছরে নির্বাচন	আগের নির্বাচনের তুলনায় ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির (লক্ষের হিসাবে)
১৯৫৭	২৭ লক্ষ
১৯৬২	২৮লক্ষ

১৯৬৭	২২লক্ষ
১৯৭২	২৩লক্ষ
১৯৭৭	৩৪লক্ষ
১৯৮২	৩৮লক্ষ
১৯৮৭	৫৫লক্ষ

এই সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৫৭-এর নির্বাচন থেকে ১৯৮২-এর নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের সংখ্যাবৃদ্ধির হারে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ছিল, অতঃপর ১৯৮৭-এর নির্বাচনে এই সংখ্যাবৃদ্ধির হার এমনই উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে যার কোনও সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণেই দশম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বামফ্রন্টের প্রবক্তারা যতই মাতামাতি করুন না কেন, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের অনেকেই এই নির্বাচনে ভুয়া ভোটারের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক রিগিং’-এর অভিযোগ উঠতে শুরু করে এই সময় থেকেই।

সি পি আই(এম)-এর প্রতিষ্ঠালাভের কলাকৌশল

১৯৮৭-১৯৯১ কালপর্ব পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের ইতিহাসের সবচেয়ে অনুজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৮৭-এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ও কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী করে বামফ্রন্ট তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর সরকারের পক্ষ থেকে সক্রিয়, ইতিবাচক উদ্যোগের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ১৯৮৭ থেকে শুরু করে পরবর্তী চার বছরে বামফ্রন্ট সরকারের যা কিছু সক্রিয়তা তা আবর্তিত হতে থাকে মূলত চমক ও হুল্লোড়, প্রতিশ্রুতি আর আস্ফালনকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু এই সঙ্কটের আশু নিরসনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা না করে সরকার ও সি পি আই(এম) রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার নাটকীয়তায় অগ্রাধিকার দিতে তৎপর। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ঋণ প্রত্যাখ্যাত হওয়া ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের নিজ উদ্যোগে এই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তা‌োলার সংকল্প ছিল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু অতঃপর যা করা হয় তা ছিল নিতান্তই হাস্যকর। সি পি আই(এম) এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর প্রকল্প গড়ে তুলবে। এই শপথের প্রেক্ষাপটে সি পি আই(এম) ও তার বিভিন্ন শাখা সংগঠন মাসের পর মাস ধরে রক্তদানের আয়োজন করে এবং রাজ্যবাসীর কাছ থেকে চাঁদা তোলার (অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে) হিড়িক পড়ে যায়। এই উদ্যোগ কার্যত হয়ে ওঠে এক উৎসবের প্রদর্শনী যার চূড়ান্ত পরিণতি পরিলক্ষিত হয় ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে যখন সি পি আই(এম)-এর হুল্লোড়প্রিয় এক বিশিষ্ট নেতা ও মন্ত্রীর উদ্যোগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুম্বই থেকে আগত শিল্পীদের নিয়ে সারা রাত ধরে অনুষ্ঠিত হয় বক্রেশ্বর, ১৯৮৯ নামক এক উদ্দাম নাচ-গানের অনুষ্ঠান।

বামফ্রন্টের প্রধান শরিকরা এই সব উদ্যোগ থেকে সঙ্গত কারণেই নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। বস্তুত গানবাজনা ও রক্তদানের আয়োজন করে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু চাঁদা তুলে যে একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিপুল ব্যয় মেটানো যাবে না এ কথা বোঝার মতো বুদ্ধি পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রায় সকলেরই ছিল এবং তাদের মধ্যে দুঃসাহসী কেউ কেউ এ বিষয়ে সমালোচনাও করেছিলেন কিন্তু সি পি আই(এম) নেতৃবর্গ তখন এমনই ক্ষমতাপ্রমত্ত এবং নিজেদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে সঠিক ও অভ্রান্ত ভাবতে এমনই অভ্যস্ত যে সেদিন এইসব সমালোচনায় তাঁরা কর্ণপাত তো করেনইনি, বরং তাঁদের একজন এই সমালোচকদের 'বরাহের বাচ্চা' বলে গালি দিয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৮৮ সালেই আনুষ্ঠানিকভাবে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ১৯৮৯ সালের ২০শে

ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে পাঁচবছরের মধ্যে এই প্রকল্প নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই ঘোষণার পর আট বছর আট মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কিন্তু এই নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। গোড়া থেকেই সরকার ও পার্টি যদি অ-কাজ সরিয়ে রেখে কাজে মনোনিবেশ করত তাহলে সম্ভবত এমনটা হত না।

কিন্তু ১৯৮৭-এ ক্ষমতায় আসার পর সি পি আই(এম)-এর প্রধান লক্ষ্য হয় সমস্ত নির্বাচনে নিজের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখে বামফ্রন্টের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখা। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয় তাকে অতিমাত্রায় সতর্ক করে তুলেছে এবং কোনওরকম ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়, যে কোনও উপায়ে নির্বাচন তাকে জিততেই হবে। স্বভাবতই ১৯৮৭-এর নির্বাচনে যে সক্রিয়তা ছিল পর্দার আড়ালে তা এখন নগ্নভাবে প্রকাশ্যে এসে পড়ে। এরই প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের অপদার্থতায় কংগ্রেস এমনই বেহাল অবস্থায় নির্বাচনে অংশ নেয় যে বহু জায়গায় সে প্রার্থী দিতেই ব্যর্থ হয় যে কারণে পাঁচ হাজার আসনে বামফ্রন্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে আসন বন্টন নিয়ে সি পি আই(এম)-এর সঙ্গে বামফ্রন্টের শরিকদের বিরোধ প্রকাশ্যে এসে পড়ে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে সি পি আই(এম) ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে বিপুলসংখ্যক আসন পেয়েছে। মোট ৬২,২৬৯ টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট দখল করেছে ৪৫,৭১৮টি আসন আর অপ্রস্তুত ও অসংগঠিত কংগ্রেস পেয়েছে ১৪,০৭১ টি আসন। তবে এই জয়গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়ে যায় নির্বাচনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত অভিযোগে। মজার ব্যাপার এই যে সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসে বামফ্রন্টেরই শরিকদের কাছ থেকে। ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রী ও নেতা ভক্তিভূষণ মণ্ডল ও কমল গুহ এবং আর এস পি-র নেতা ও মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (যাঁর আগ্রহাতিশয্যেই বামফ্রন্ট জমানায় প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল) প্রকাশ্যে অভিযাোগ আনেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই(এম) ব্যাপক সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে। সি পি আই(এম) যথারীতি অভিযাোগনস্যাৎ করে দেয় এবং পাছে সরকার ছেড়ে চলে যেতে হয় এই আশঙ্কায় অভিযাগকারী ছোট শরিকরা নিশ্চুপ হয়ে যায়।

ক্ষমতার লোভে বামফ্রন্টের ছোট শরিকরা কত অসহায় হয়ে পড়েছে কয়েক মাস পরেই তার আর এক প্রমাণ পাওয়া যায় যখন প্রবীণ আর এস পি নেতা ও পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বেঙ্গল ল্যাম্প সম্পর্কিত তথ্য ফাঁস করে দিয়ে সিপিআই(এম) ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরাগভাজন হন। যতীন চক্রবর্তী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং সেই সুবাদে তিনি ছিলেন জ্যোতি বসুর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন

ও ঘনিষ্ঠ এক সহযোগী। ১৯৮৮ সালে তাঁরই প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে জনসমক্ষে হঠাৎ প্রকাশিত হয় এই তথ্য যে বেঙ্গল ল্যাম্প সম্পর্কিত সরকারি বরাত দেওয়ার ব্যাপারে প্রভাব খাটিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান চন্দন বসু। এই সংবাদ প্রকাশিত হলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পূর্তমন্ত্রীর যে নোটে এই তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য যতীন চক্রবর্তীকে মৌখিক আদেশ দেন। কিন্তু যতীন চক্রবর্তী এই আদেশ পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে রুষ্ট জ্যোতি বসু মন্ত্রিপদ থেকে যতীন চক্রবর্তীকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আর এস পি-র ওপর ফরমান জারি করেন এবং অসহায় আর এস পি কার্যত বিনা প্রশ্নে যতীন চক্রবর্তীকে পদত্যাগে বাধ্য করে। এইভাবেই কোনও নীতিগত কারণে নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট বামপন্থী যোদ্ধার রাজনৈতিক জীবন কার্যত শেষ হয়ে যায় এবং ক্ষমতার লোভে তাঁর দলও তাঁকে বর্জন করতে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

১৯৮৯ সালের ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া পুরসভা নির্বাচন। বামফ্রন্ট শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে সর্বপ্রথম ব্যাপক হাঙ্গামা হয় এই নির্বাচনেই। নির্বাচন উপলক্ষে হাওড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা লুম্পেনদের দখলে চলে যায়, ভোটারদের ভয় দেখানো হয় এবং অবাধে গুলি বোমা চলে। নির্বাচনের দিন সন্ত্রাসের বলি হন একজন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। রিগিংয়ের অভিযোগ এনে কংগ্রেস সভাপতি বরকত গনিখান চৌধুরী ১৪টি ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। এই দাবি যথারীতি বাতিল করা হয় এবং ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে আগের বারের তুলনায় বামফ্রন্ট অনেক বেশি আসন পেয়েছে, ৫০টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৩১টি আসন এবং ১৯টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস।

এই মার্চ মাসেই ছোট একটি সংবাদ নিয়ে রাজ্যবাসীর অনেকের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। সংবাদটি ছিল এই যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা খরচ ধার্য করে (চূড়ান্ত পর্যায়ে যা আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল) মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর নতুন করে সাজানো হচ্ছে। একজন মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এরূপ বিলাসবহুল আয়োজন দেখে অনেকে বিস্মিত হন, কেউ কেউ আহতও হন এবং সকলেই স্মরণ করেন যে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে মহাকরণে নিজের ব্যবহারের জন্য আধুনিক বাথরুম বানিয়েছিলেন বলে বামপন্থীরা ও আরও অনেকে তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এক অর্থে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর সাজানোর ঘটনাটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন সি পি আই(এম) উৎপীড়িত শ্রমিক কৃষকশ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। স্বভাবতই বামফ্রন্ট শাসনের প্রথম কয়েক বছরে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁরা ছিলেন এই শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত

রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী অথবা নিতান্তই সাধারণ মানুষ যাঁদের সকলেরই অবস্থান ছিল নীচের তলার মানুষের কাছাকাছি। পোশাক-পরিচ্ছদে, রুচিতে, ব্যবহারে এঁরা ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। স্বভাবতই মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মতো মানসিকতা তাঁদের ছিল । কিন্তু দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে বামফ্রন্ট সরকার যখন যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে শুরু করে তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সি পি আই(এম)-এর বিশেষ সৌহাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতঃপর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার পর দেখা যায় যে উচ্চবিত্ত শ্রেণী সি পি আই(এম) কে তাঁদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে অথবা তার বাইরের করিডরে তাঁদের ভিড় করতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সভা-সমিতিতে যাচ্ছেন এবং যোগ দিচ্ছেন তাঁদের ভোজসভায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরটিকে আধুনিক সাজে সজ্জিত করা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার চলাকালীন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও বামফ্রন্ট সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী যে প্রমোটাররাজ ও কন্ট্রাক্টররাজ সম্পর্কে খেদোক্তি করেছিলেন তার সূত্রপাত হয় তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার পর থেকেই।

১৯৮৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় নবম লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস জাতীয় পর্যায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৮৪-এর নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস শশাচনীয় ফল করে। ১৯৮৪ তে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৬টি আসন। এবার কংগ্রেস পায় মাত্র ৪টি আসন এবং তার সহযোগী জি এন এল এফ পায় ১টি আসন। পক্ষান্তরে বামফ্রন্ট পায় ৩৭টি আসন এবং সি পি আই(এম) পায় ২৭ টি আসন লক্ষণীয় যে সি পি আই(এম) ৩৮.৪০% ভোট পেয়ে এই ২৭টি আসন দখল করে। অন্যদিকে কংগ্রেস মাত্র ৪টি আসন পেলেও সে ভোট পায় ৪১.৪০ শতাংশ এবং জি এন এল এফ পায় ১.৪০ শতাংশ। নির্বাচনের পর সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। সরকার পক্ষ এই অভিযোগকে অক্ষমের নিষ্ফল আস্ফালন বলে গণ্য করেন।

সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ অবশ্য লক্ষ করেন যে ১৯৮৭ সালের ভোটার সংখ্যায় যে অভূতপূর্ব ও ব্যাখ্যার অযোগ্য বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল ১৯৮৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও তা অব্যাহত। ১৯৮২-এর বিধানসভা নির্বাচনের পাঁচ বছর পরে ১৯৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার বেড়েছিল ৫ লক্ষ। এবারও একই চিত্র দেখা যায়। ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ। মাত্র দুবছর পরে ১৯৮৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা হয় ৪ কোটি ৪ লক্ষ। অর্থাৎ, দুবছরের মধ্যে ভোটার সংখ্যা বাড়ে ৫০ লক্ষ। সি পি আই(এম)প্রকাশিত নবম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য পুস্তিকায় অবশ্য

দেখানো হয়েছিল যে এই বাড়তি ৫০ লক্ষের মধ্যে ২৫ লক্ষ ১৫ হাজারই ছিল ১৮ থেকে ২১ বছরের নতুন ভোটার। এই তথ্য মেনে নিলেও দু বছরে ২৫ লক্ষ ভোটার বাড়াটা আশ্চর্যজনকই থেকে যায়। আরও লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে ১৯৮৯-এর নির্বাচন সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের চরম দুর্দিনের সূচক ছিল। কিন্তু এই দুর্দিনে ও বারো বছর রাজ্য শাসন করেও বামফ্রন্ট কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে পারেনি, কংগ্রেস অনায়াসে এককভাবে পায় ৪১.৪০ শতাংশ ভোট।

১৯৯০-এর গোড়ার দিকে সি পি আই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন শৈলেন দাশগুপ্ত। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বামফ্রন্টের তিন প্রধান শরিক সি পি আই, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবল আপত্তিতে কোনওরূপ কর্ণপাত না করে সি পি আই(এম)-এর স্কুল শিক্ষামন্ত্রী স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ থেকে কমিয়ে ৬০ করেন। এতে ফ্রন্টের ছোট শরিকদের অসহায় অবস্থাটা রাজ্যবাসীর নতুন করে দৃষ্টিগোচরে হয়। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই কলকাতা নগরীতে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত এক আততায়ী পরপর ১৩ জন নিদ্রিত ফুটপাথবাসীকে পাথর মেরে হত্যা করে। কিন্তু কলকাতা পুলিশ দপ্তর এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তথাপি তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার বীরেন সাহার ওপর সরকারের আস্থা অটুট থাকে। অথচ কিছুকাল পরে কেওড়াতলার শ্মশানে পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতেই যখন এক মন্ত্রী অপদস্থ হন তখন কিন্তু কমিশনার পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে সরকারের বিলম্ব হয় নি।

১৯৯০ সালের ২৭ মে ৭৪ টি পুরসভার নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও রিগিংয়ের অভিযোগ জানাতে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে তেরো বছরের বামফ্রন্ট জমানায় কংগ্রেস সর্বপ্রথম ভাল ফল করেছে। বামফ্রন্ট জয়ী হয় ৫০টি পুরসভায় আর কংগ্রেস ৭টি পুরসভা ছিনিয়ে নেয় বামফ্রন্টের কাছ থেকে। তেরো বছরের বামফ্রন্ট শাসনে এ ছিল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা এবং এতে প্রমাণিত হয় যে শহরাঞ্চলের মানুষ বামফ্রন্ট সম্পর্কে বিরূপ হচ্ছেন।

পুরসভা নির্বাচনের ঠিক তিন দিন পরে বানতলায় প্রকাশ্যে একদল দুষ্কৃতীর হাতে লাঞ্ছিত ও নিহত হন কর্তব্যরত স্বাস্থ্যদপ্তরের অফিসার অনিতা দেওয়ান। একই সঙ্গে গুরুতর আহত হন ইউনিসেফের কর্মী রেনু ঘোষ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী উমা ঘোষ এবং তাঁদের গাড়ির আহত চালক অবনী নাইয়া মারা যান হাসপাতালে। এর কিছুদিন পরে বিরাটির ঝুপড়িতে ঘটে গণ ধর্ষণের ঘটনা। বানতলা, বিরাটির ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ হন, বিশেষত শহরাঞ্চলে ও কলকাতা মহানগরীতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা

দেয়। সংবাদপত্রে সে সময় প্রকাশিত হয় যে বানতলার ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'এরকম তো হয়েই থাকে।' ক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গবাসী এই মন্তব্যে আরও ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনার অনেকদিন পরে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান যে এমন মন্তব্য তিনি আদৌ করেননি। হয়তো সংবাদপত্রের কোনও প্রতিবেদক মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল রিপোর্টিং করেছিলেন। তবে পশ্চিমবঙ্গবাসী সেদিন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা হল এই যে তিনজন মহিলাকে বানতলায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে আঘাত হেনে তাঁদের একজনকে ঘটনাস্থলে হত্যা করার মতো বর্বরতা ঘটে যাওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভুটান সফর বাতিল করে ঘটনাস্থলে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে যাননি এবং আক্রান্ত মহিলাদের ও শোকসন্তপ্ত দুটি পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এত বড় লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরে ১৯৯০-এর জুন মাসে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন উপলক্ষে আর এক চরম লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে খোদ কলকাতা মহানগরীতে। ১৯৮৫-এর কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেস বামফ্রন্টের প্রায় সমান সংখ্যক আসন পায় এবং বামফ্রন্ট কোনও মতে ও কিঞ্চিৎ কৌশল করে তার মান রক্ষা করে। অথচ ১৯৯০-এর নির্বাচনে বামফ্রন্ট দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তেরো বছরের বামফ্রন্ট শাসনকালে কলকাতায় তার নির্বাচনী সাফল্যের নতুন রেকর্ড গড়ে। কিন্তু এই নির্বাচনী ফলাফল ছিল অবিশ্বাস্য। কারণ ১৯৮৫-এর কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের পর ১৯৮৭ সালে যে বিধানসভা নিবার্চন হয় তাতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কলকাতার মোট ২২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ১৩টি আসন ও ৫০.১৭ শতাংশ ভোট আর বামফ্রন্ট পায় ৯টি আসন ও ৪৫.৫২ শতাংশ ভোট। অতঃপর ১৯৯০-এর কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের মাত্র সাত মাস আগে ১৯৮৯-এর নভেম্বরে যে লোকসভা নির্বাচন হয় তাতে কলকাতা মহানগরীতে কংগ্রেসের মোট প্রাপ্ত ভোট ছিল ৮,৬৩,৩৪১ আর বামফ্রন্ট পেয়েছিল মোট ৭,৮০,৯৮০টি ভোট। এই তথ্যাবলী প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গে যা-ই হোক, কলকাতা মহানগরীতে সব নির্বাচনেই কংগ্রেস বামফ্রন্টের তুলনায় পিছিয়ে নেই বরং এগিয়ে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৯০-এর কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে বামফ্রন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন অবিশ্বাস্য বলে বিবেচিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এই অবিশ্বাস্য ফলাফল কেন হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধান কঠিন ছিল না। নির্বাচনের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির নিরপেক্ষ মানুষ নিজ চোখেই দেখেছিলেন কীভাবে বন্দুক বোমা নিয়ে লুম্পেনরা নিষ্ক্রিয় পুলিসের চোখের সামনে ভোটদান কেন্দ্রগুলিতে সন্ত্রাসের

সৃষ্টি করেও প্রকৃত ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে ছাপ্পা ভোটের ব্যবস্থা করেছিল। নির্বাচনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সংবাদপত্রে এই কুকর্মের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সন্ত্রাসের সাক্ষ্য হিসাবে ছাপানো হয়েছিল অনেক আলোকচিত্র। কিন্তু ১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর সিদ্ধার্থ রায় যেমন সদম্ভে রিগিংয়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন তেমনই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তাঁর দলীয় মন্ত্রীরা জোর গলায় ঘোষণা করেন যে ১৯৯০-এর কলকাতা পুরসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে ও অবাধে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে রাজ্যের জনসাধারণ বুঝে যান যে অনৃত ভাষণের ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টে কোনও তফাত নেই।

বামফ্রন্ট সরকার ও বিপন্ন বাঙালি সমাজ

১৯৯০-এর জুন মাসে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মহানগরীতে যে তাণ্ডব চলছিল দুমাসের মধ্যেই তার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। ইতিমধ্যে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম খুবই বেড়ে গেছে এবং সরকার ট্রামবাসের ভাড়া বাড়িয়েছে অযৌক্তিক হারে। এই সব কারণে জনসাধারণ স্বভাবতই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এবং এই ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে বিরোধী দল কংগ্রেস সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে তৎপর। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাংলা বনধ ডাকে এবং এই বনধের দিন ধার্য হয় ১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট। বনধের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই(এম) -এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই অবাঞ্ছিত বন্‌ধের প্রতিরোধে দল তার ক্যাডার বাহিনীকে রাস্তায় নামাবে। অতঃপর বধের দিন সকাল থেকে সি পি আই(এম)-এর ক্যাডারবাহিনী রাস্তার মোড়ে মোড়ে মোতায়েন হয়ে প্রহরা দিতে থাকে। ইতিমধ্যে বেলা বাড়লে এক চরম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায় হাজরার মোড়ে। যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ কলকাতা থেকে আগত কংগ্রেসের এক বড় মিছিল হাজরার মোড়ে এসে পৌঁছালে সি পি আই(এম)-এর ক্যাডারবাহিনী দ্বারা তা আক্রান্ত হয় এবং কলকাতা জেলা সি পি আই(এম) -এর এক আঞ্চলিক নেতার ভাইয়ের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুতর আহত হন, আহত হন দুই কংগ্রেসি কাউন্সিলার এবং সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে কলকাতা পুলিশের নিষ্ক্রিয় দুজন সহকারী কমিশনারের চোখের সামনে। ফ্যাসিবাদী কায়দার এই বর্বর আক্রমণে সি পি আই(এম)-এর ভাবমূর্তি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য দিকে জঙ্গী নেত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের পুরোভাগে চলে আসেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। এ ছাড়া এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ রাজ্য কংগ্রেস সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলত রাজ্য কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতার সম্মিলিত উদ্যোগে বিশাল ও বহুমুখী মিছিল সহযোগে রাজ্য কংগ্রেস অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মহাকরণ অভিযান করে ১৯৯০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। এই অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন হুইল চেয়ারে আসীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, এই অভিযানের এক মাসের মধ্যেই যাঁর জীবনাবসান ঘটে।

ইতিমধ্যে আশির দশক শেষ হতে চলেছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ হতে চলেছে বামফ্রন্ট শাসনের চোদ্দ বছর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটা একেবারেই উজ্জ্বল নয়। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছে। চোদ্দ বছরেও বিদ্যুৎ সঙ্কটের কোনও

সুরাহা হয়নি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছর বিদেশে যাচ্ছেন রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের সংকল্প নিয়ে এবং ফিরছেন শূন্য হাতে। অবশ্য জাতীয় স্তরে মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা এখন অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রে অকংগ্রেসি সরকার স্থাপিত হওয়ার পর থেকে জাতীয় রাজনীতিতে তিনি এক অতি ওজনদার নেতা এবং এই কারণে তাঁকে প্রতি সপ্তাহেই দিল্লি যেতে হয়। অতীতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় ঘন ঘন দিল্লি যেতেন বলে তাঁর দিল্লিবাস নিয়ে সাধারণ বাঙালি ট্রামে বাসে-বৈঠকখানায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। এখন দেখা যায় যে মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা ও দিল্লি যাত্রা উপহাসপ্রিয় বাঙালির এক সরস আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে রাজ-তখতে যিনি বসেন সাধারণ মানুষের কোনও কথাই তাঁর কানে পৌঁছায় না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা ও দিল্লি যাত্রা আজও অব্যাহত। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানায় আশির দশক শেষ হয় যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গেই। ১৯৯০ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেলুড়ে সিটুর রাজ্য সম্মেলন শুরু হয় রাজসিকভাবে। এই সম্মেলন উপলক্ষে ব্যয় হয় চল্লিশ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকের অবস্থা না ফিরলেও সি পি আই(এম) নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের অবস্থা যে ফিরে গেছে তা বোঝা যায় এই ব্যয়বহুল রাজ্য সম্মেলন দেখে।

ইতিমধ্যে দশম লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলে বামফ্রন্ট নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই একই সঙ্গে একাদশ বিধানসভা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তদনুযায়ী বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে নিবাচনী প্রচারাভিযান শুরু করে ১৯৯১ সালের ২৫ মার্চ। অন্যদিকে সদ্য নিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থ রায় ও তাঁর সহযোগীরা তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়ার জন্য প্রার্থী মনোনয়নের কাজটি শেষ করতে পারেননি। লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ২০, ২৩ ও ২৬ মে। তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২৩৮টি বিধানসভা আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২০ মে। ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামপুদুরে আততায়ীর হাতে রাজীব গান্ধী নিহত হওয়ায় নিবাচন স্থগিত রাখা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে বাকি নির্বাচন শেষ হয় ১৫ জুন। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গে ভোট গণনা শুরু হয় ১৬ জুন, অথাৎ, ২৩৮টি আসনের ভোট গণনার কাজ শুরু হয় ভোট গ্রহণের ২৬ দিন পরে।

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে বামফ্রন্ট তিন-চতুথাংশ আসন দখল করে ও চতুর্থবার ক্ষমতাসীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে সর্বকালীন রেকর্ড করেছে এবং সি পি আই(এম) ১৮২টি আসনে জয়ী হয়ে যথারীতি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্য দিকে কংগ্রেস ১৯৮৭-এর নির্বাচনের তুলনায় প্রান্তিক উন্নতি ঘটিয়ে এই নির্বাচনে জয়ী হয় ৪৩টি আসনে। লক্ষণীয় যে দশম বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় একাদশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট, সিপিআই(এম) ও কংগ্রেস সকলেরই প্রাপ্ত ভোটের হার কমে যায়।

বামফ্রন্ট পায় ৪৮ শতাংশ ভোট, সি পি আই(এম) এককভাবে ৩৬.৮২ শতাংশ আর কংগ্রেস পায় ৩৫.০৪ শতাংশ ভোট। এই ভোট কমে যাওয়ার কারণ ছিল বি জে পি। ১৯৮৭-এর নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ০.৫১ শতাংশ ভোট। এবার সে পায় ১১.৪১ শতাংশ ভোট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই নির্বাচনেও ভোটারের সংখ্যা বাড়ে অবিশ্বাস্য হারে। ১৯৮৯-এর নভেম্বরে যে লোকসভা নির্বাচন হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪ লক্ষ। ১৯৯১-এর নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা হয় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ। অর্থাৎ, কার্যত এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৯ লক্ষ ভোটার বাড়ে। বিষয়টি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও একই চিত্র পাওয়া যায়। যেমন, দেখা যায় যে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বেড়েছে ২৪.৫৫ শতাংশ হারে, অথচ ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই নয় বছরে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ৩০.২০ শতাংশ হারে। এই সব কারণে ১৯৯১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি।

ভোট গণনা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে। কংগ্রেস অভিযোগ করে যে সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য সি পি আই(এম) গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস চালিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। অন্যদিকে সি পি আই(এম) এগুলিকে সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ হিসাবে গ্রহণ করে। যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, ঘটনা এই যে ১৯৯১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরেই গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে হাওড়ার কান্দুয়া ও জগৎবল্লভপুরে, মেদিনীপুরের ঘাটাল, কেশপুর ও ডেবরায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুরে এবং কলকাতার গার্ডেনরিচে খুন হন এক প্রাক্তন কংগ্রেসি কাউন্সিলার। ইতিমধ্যে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা হয়েছেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন রাজ্য যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে চতুর্থবার ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার পর দেখা যায় যে সরকারের যথারীতি ইতিবাচক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপরিকল্পিত ও সুবিস্তৃত কোনও কর্মসূচি নেই। সরকার অবশ্য আগের মতোই এখনও যৌথ উদ্যোগে আস্থাশীল এবং সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যৌথ বা বেসরকারি উদ্যোগের সাযুজ্যে সরকার শুধু কলকাতা নগরীকে সাজাতে আগ্রহী। তাই ১৯৯১ সালের ২৭ অক্টোবর ঘোষিত হয় যে রবীন্দ্র সরোবরকে সুরম্য এক প্রমোদকাননে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে শ্রাবণ টোডির কোম্পানিকে, নভেম্বরে ঘোষিত হয় যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গড়ে তোলার জন্য ডি সি এল কোম্পানিকে লবণ হ্রদে ২৩০ একর জমি দেওয়া হবে। বডন স্কোয়ারে (যেখানে আগে বামফ্রন্ট সরকার বাণিজ্যিক কেন্দ্র

তৈরি করার পরিকল্পনা রূপায়িত করতে পারেনি আন্দোলনের চাপে পড়ে) অরুণ বাজোরিয়ার অর্থানুকূল্যে প্রস্তাবিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিলান্যাস করা হয় ৩০ ডিসেম্বর এবং ১৯৯২ সালের ২৯ মার্চ ময়দানের শহিদ মিনার নয়নাভিরাম আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে ব্রিটানিয়া কোম্পানির উদ্যোগে।

কলকাতাকে যখন এইভাবে সাজানোর চেষ্টা চলছে। তখন কলকাতার রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ বেহাল অবস্থায় এবং হকারদের দখলদারিতে ফুটপাথে কোনও পথচারীই হাঁটতে পারেন না, তাঁরা গাড়ি চলাচলের রাস্তা ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এতে চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়ে যে প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে সেদিকে সরকারের নজর নেই। অবশ্য নজর থাকলেও সরকারের পক্ষে বড় কিছু করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। কারণ ১৯৯১ সালে মতায় এসই বামফ্রন্ট সরকার চরম আর্থিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জুলাই মাস নাগাদ টাকার অভাবে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ আর্থিক পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে সরকারকে সমস্ত নজির ভেঙে একটি বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কর্মচারীদের এক মাসের মাইনে দিতে হয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থব্যয় করে বিপুল উদ্যমে চলতে থাকে সাক্ষরতা অভিযান। বস্তুত, চতুর্থবার ক্ষমতাসীন হয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দেয় সাক্ষরতা কর্মসূচিতে এবং জেলায় জেলায় বর্ণাঢ্য মিটিং-মিছিলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাক্ষরতা অভিযান। ইতিমধ্যে একটি মহৎ কর্ম করে বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সরকারিভাবে ঘোষিত হয় যে মেডিক্যালে ভর্তির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কোটার আসন সংখ্যা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে এই মুখ্যমন্ত্রীর কোটা ব্যাপারটা ছিল এক চরম লজ্জার বিষয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মতো একটি শক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা যখন মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে তখন মুখ্যমন্ত্রীর কোটার সুযোগ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে কিছু অযোগ্য ছাত্রছাত্রীকে পিছনের দরজা দিয়ে মেডিক্যালে ভর্তির ব্যবস্থা করা ছিল এক চরম সামাজিক অবিচার যাতে কায়েমি স্বার্থের পরিপোষণ ছাড়া আর কোনও মহৎ উদ্দেশ্যই যে সাধিত হতে পারে না সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। অথচ বামফ্রন্ট শাসনের গোড়া থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কোটা ব্যবস্থা চালু ছিল এবং ১৯৯১ সালে এই অন্যায় কোটা বাড়তে বামফ্রন্ট তথা সি পি আই(এম) এর কোনও চক্ষুলজ্জাও হয় নি। উনিশ বছর ধরে রাজ্য শাসন করার পর অবশেষে শাসক দলের এ বিষয়ে চৈতন্য হয়। ১৯৯৬ সালে পঞ্চম বার ক্ষমতাসীন হয়ে বামফ্রন্ট সরকার মুখ্যমন্ত্রীর কোটা নামক লজ্জাজনক বস্তুটির বিলোপ ঘটায়।

ইতিমধ্যে সাংগঠনিক দিক থেকে সি পি আই(এম) আরও স্ফীতকায় হয়েছে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে তার সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১,৮৯,৭৩২। তবে পার্টি নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে, শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং পার্টির মধ্যে দেখা যাচ্ছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠী সংঘর্ষ অতীতে যা ছিল অকল্পনীয়। ১৯৯২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর জেলা সি পি আই(এম)-এর সম্পাদক সুকুমার সেনগুপ্ত ইস্তফা দেন সম্পাদক পদ থেকে। ঘটনাটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সি পি আই(এম)-এর জন্মলগ্ন থেকে সুকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক এবং তাঁর পদত্যাগের যে কারণ দেখানো হয়েছিল তা ছিল যথেষ্ট অস্পষ্ট।

এই সময় অবশ্য সাংগঠনিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য কংগ্রেসেরও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে এবং জেলায় জেলায় হাঙ্গামা ও মারামারি হয়। কংগ্রেস এখন স্পষ্টতই মমতা-শিবির ও সোমেন-শিবিরে বিভক্ত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দুই গোষ্ঠীর ঝগড়া প্রকাশ্যে এসে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হন সোমেন মিত্র। দুমাস পরে ১৯৯২ সালের ৮ জুন বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন ব্যাপক হাঙ্গামা হয় এবং কংগ্রেস সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ আনে। এ ছাড়া পুলিসের গুলিতে সেদিন বালিগঞ্জে স্বপন চক্রবর্তী নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। নির্বাচন উপলক্ষে পুলিসের গুলি চালনায় জনমনে ক্ষোভ দেখা দেয় এবং অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে এই গুলি চালনা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অতঃপর ৮ জুনের ঘটনার প্রতিবাদে ১০ জুন কংগ্রেস বারো ঘন্টার ও সি পি আই(এম) চব্বিশ ঘন্টার বন্ধ ডাকে। দুদিন পরে সি পি আই(এম) আবার বাঙলা বনধ ডাকে। এরপর ৬ নভেম্বর আবার বাঙলা বনধ ডাকে কংগ্রেস। অন্যদিকে ২৫ নভেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ব্রিগেড ময়দানে কংগ্রেসের এক বিশাল জনসভা হয়। বোধ করি, তার সঙ্গে পাল্লা দিতেই মাত্র চারদিন পরে একই জায়গায় সি পি আই(এম) এক বিশাল জনসভা করে। প্রধান দুই রাজনৈতিক পক্ষ যখন এইভাবে বন্ধ আর জনসভার প্রতিযোগিতায় মত্ত তখন সরকারি কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে, ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বর মাসে উন্নয়নের সব টাকা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার এবং অক্টোবরে সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা প্রার্থীদের কাছ থেকে ফি নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ায় এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে ২ নভেম্বর তারিখে। হরিহরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে অবাধে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য চলতে থাকায় এবং এ ব্যাপারে পুলিস

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় ওই এলাকার মানুষ নাগরিক কল্যাণ পরিষদ নামে একটি সংস্থা তৈরি করে সমাজবিরোধীদের প্রতিরোধে নিজেরাই তৎপর হয়ে ওঠেন। দুভাগ্যক্রমে তাঁদের তৎপরতা রুখতে পুলিস সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ প্রতিরোধকারীদের ওপর পুলিস অবশেষে গুলি চালায় যাতে সাতজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এতে দলমত নির্বিশেষে হরিহরপাড়ার বাসিন্দারা এতই রুষ্ট হন যে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে কয়েকদিনের জন্য পুলিস কার্যত নির্বাসিত হয় এবং পুলিস মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এলাকা পরিদর্শনে গেলে স্লোগান দিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে বলা হয়। হরিহরপাড়ার ঘটনার প্রতিবাদে ৬নভেম্বর কংগ্রেসের ডাকা বাংলা বন্ধ প্রায় সর্বাত্মক হয়। এক মাস পরে ৭ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট উভয়ের-ডাকা বন্ধ পালিত হয়। এই বনধও সর্বাত্মক হয়। তবে এতৎসত্ত্বেও মধ্য ও পূর্ব কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যার কবলে পড়ে তিনদিন ধরে। কলকাতাবাসী বিপর্যস্ত হন। দাঙ্গা দমনে বামফ্রন্ট সরকার যথোপযুক্ত তৎপরতা দেখায় যে কারণে কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতা শহরে শান্তি ফিরে আসে। তবে অভিযোগ ওঠে যে কোনও কোনও এলায় দাঙ্গাবাজির নেতৃত্বে ছিল সি পি আই(এম)-এর আশ্রিত ও প্রশ্রয়পুষ্ট কিছু কুখ্যাত মস্তান। বলাবাহুল্য, সি পি আই(এম) এই অভিযোগ অস্বীকার করে।

১৯৯৩ সালে শুরু হয় এক অপ্রীতিকর ঘটনা দিয়ে। ৭ জানুয়ারি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে ধরনা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারের পুলিস বাহিনী তাঁকে ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়ে মহাকরণের বাইরে বের করে দেয় এবং প্রধান গেট দুটি বন্ধ করে দেয়। অতঃপর এই ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য মহাকরণে জমায়েত সাংবাদিকদের ওপর পুলিস লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে থেকে ঐতিহাসিক প্রেস কণারটি সরিয়ে দেওয়া হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র মহলে তুমুল ক্ষোভ দেখা দেয় এবং তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে ওঠে। দুমাস পরে মার্চ মাসে কলকাতায় বউবাজারে আকস্মিক বিস্ফোরণে একটি বাড়ি ধসে পড়ে। এতে এলাকার যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয় এবং কয়েকজন হতাহত হন। জানা যায় যে বাড়িটিকে বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদাম হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই এই দুর্ঘটনা এবং এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হন কলকাতার মাফিয়া ডন হিসাবে পরিচিত রশিদ খান। কিন্তু অভিযোগ ওঠে যে রশিদ খানকে রক্ষা করার জন্য পুলিস যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

এই অভিযোগ অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এই কারণে যে ইতিমধ্যে নানা সূত্রে যেসব চাঞ্চল্যকর খবর বের হতে থাকে তার সারমর্ম ছিল এই যে সি পি আই(এম)-এর কলকাতা জেলা কমিটির

বিভিন্ন প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে রশিদ খানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং রশিদ খান তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই প্রেক্ষাপটে বউবাজার বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই ঘটনার মাধ্যমে সি পি আই(এম)-এর সঙ্গে অন্ধকার জগতের যোগাযোগ প্রকাশ্যে এসে পড়ে।

উল্লেখ্য যে সি পি আই(এম) ব্যাপারটিকে নিছক গুজব বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি। এ বিষয়ে পার্টি তদন্ত করে এবং দুয়েকজন ছোট মাপের নেতাকে এ জন্য শাস্তিও দেয়। কিন্তু পার্টির বদনাম এতে ঘোচেনি। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ১৯৯৩-এর ১৭ অক্টোবর সি পি আই(এম)এর কলকাতা জেলা কমিটির সভায় প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা বিনয় চৌধুরি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে ‘‘মস্তান পুষতে গেলে সেই মস্তান একদিন মাথায় চেপে বসে’’। আদর্শবাদী কমিউনিস্ট নেতা সঠিক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে চলার মতো অবস্থা তখন আর পার্টির নেই। ভোটের রাজনীতি তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যেখান থেকে ফেরা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

বামফ্রন্টের জয়-পরাজয়

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং সেই সঙ্গে কিছু পুরসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৯৩ সালের ৩০ মে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩,০৩,৬৪,৫১৩। পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে মেদিনীপুর জেলায়। নির্বাচনের দিনেও সংঘর্ষ হয় বিভিন্ন জেলায়। পুর নির্বাচনে কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে ভাল ফল করে। বহরমপুর পুরসভা দখল ছিল কংগ্রেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কারণ এই পুরসভা নিয়ে অতীতে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে অনেক জলঘোলা হয়েছিল। অন্যদিকে হাবরা পুরসভা বামফ্রন্টের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বি জে পি রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল তোলে। অতীতের তুলনায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। তবে প্রান্তিক উন্নতি করে কংগ্রেস আর বিস্ময়কর অগ্রগতির নজির রাখে বি জে পি। ১৯৮৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলের তুলনায় সি পি আই(এম) পায় ৬.৪২ শতাংশ কম আসন এবং কংগ্রেস পায় ৩.২৬ শতাংশ বেশি আসন। অন্যদিকে যে বি জে পি ১৯৮৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেয়েছিল মাত্র ৩২টি আসন, ১৯৯৩-এর নির্বাচনে সে পায় ২৩৩৯টি আসন।

প্রায় দুমাস পরে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় মহাকরণ অভিযান। এই অভিযান উপলক্ষে প্রায় বিনা প্ররোচনায় পুলিস গুলি চালায়। এতে বারোজন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং আহত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। পুলিসের গুলিতে এই গণহত্যার ঘটনায় মর্মাহত হন রাজ্যবাসী। এছাড়া এই গুলিচালনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাচ্ছিল্য মিশ্রিত এমন এক লঘু মন্তব্য করেন যাতে অনেকেরই ক্ষোভ বাড়ে। পুলিসকে যাঁরা বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার অন্যতম নিগ্রহ যন্ত্র বলে গণ্য করেন সেই বামপন্থীদের সরকারকে পুলিসি গুলিচালনায় নির্বিকার থাকতে দেখে বিস্ময় বোধ করেন শিক্ষিত শ্রেণীর দলনিরপেক্ষ অংশ। এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে সি পি আই (এম) এক বড় ধাক্কা খায় ভিতর থেকে। ২৯ আগস্ট হঠাৎ সরকার থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্যের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সি পি আই(এম) নেতার মন্ত্রিপদত্যাগ ছিল এক খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা। কেন তিনি পদত্যাগ করেছিলেন তার সঠিক কারণ আজও অজ্ঞাত। সংবাদপত্রে সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল যে চোরের সরকারে থাকতে চান না বলেই তিনি পদত্যাগ করেছেন এমন একটা মন্তব্য তিনি নাকি করেছিলেন এবং জনশ্রুতি ছিল এই যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধই ছিল তাঁর পদত্যাগের মূল কারণ। অবশ্য কিছুকাল পরে তাঁকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং তারপর থেকে

মুখ্যমন্ত্রীর সবিশেষ অনুগত এক নেতা ও মন্ত্রী হিসাবেই তাঁকে দেখা যেতে থাকে এবং আজও এই ধারা অব্যাহত।

ইতিমধ্যে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে তেলেনিপাড়ায় ভিক্টোরিয়া জুটমিলের বেতন ও বোনাস থেকে বঞ্চিত শ্রমিকরা শুরু করে তাদের প্রতিবাদী আন্দোলন। লক্ষণীয় যে এই আন্দোলন শুধু কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই নয়, তা ছিল শ্রমিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধেও। মহাষষ্ঠীর দিন এই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং বামফ্রন্ট সরকারের পুলিস বারো রাউন্ড গুলি চালিয়ে তাদের কর্তব্য পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে এই সব ঘটনা যখন ঘটছে তখন রাজ্য কংগ্রেস যথারীতি তার ঘরোয়া ঝগড়ায় মত্ত। একদিকে হাওড়া পুরসভা নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কলহ চলছে এবং অন্যদিকে সোমেন মমতার বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই বিরোধের পরিণামে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালের ১০ অক্টোবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক পদ ত্যাগ করেন।

হাওড়া পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ নভেম্বর। নির্বাচনের দিন হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাস ও হাঙ্গামা চলে এবং পুলিসের গুলিতে ১ জন নিহত ও ১ জন গুরুতর আহত হন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে পুরসভার মোট ৫০টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৩১টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছে। ১৮টি আসন এবং ১টি আসন গেছে নির্দল প্রার্থীর দখলে। এই নির্বাচনে অবশ্য সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। অতঃপর ৫ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার নানুরে খাস জমি বিলির দাবিতে আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের ওপর পুলিস গুলি চালায় এবং নিহত হন একজন। একই তারিখে কলকাতায় আয়োজিত এক সভায় গণনাট্য সঙ্ঘের অগ্রগতিতে অসামান্য অবদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় যদিও ওই সভায় দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনও যোগাযোগই ছিল না। এই সভায় জ্যোতি বসুর বিশেষ কাছের মানুষ হিসাবে পরিচিত মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তি জ্যোতি বসুকে মহাপুরুষ, মহাযোগী ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে অভিহিত করে তাঁর প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন। অবশ্য কোন বিচারে মুখ্যমন্ত্রী মহাপুরুষ ও মহাযোগী তা বুঝবার ক্ষমতা সেদিন পশ্চিমবঙ্গে অনেকেরই ছিল না।

যাই হোক, বামফ্রন্ট জমানায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৩ সালটি শেষ হয় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই আপ্তবাক্য অনুসরণ করেই। ১১ ডিসেম্বর যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর উদ্যোগে লবণ হ্রদ নগরে অনুষ্ঠিত হয় রসগোল্লা খাওয়ার প্রতি যোগিতা। মিষ্টান্ন দ্রব্য খাওয়ার এই হুল্লোড় দেখে মনে হতে থাকে যে পশ্চিমবঙ্গে বুঝি সব সমস্যার নিরসন হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৯৩ সাল শেষ হওয়ার পর পুলিসের তৈরি

করা এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই ষোল বছরে পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের গুলি চলেছে ২৭৪৭ বার এবং তাতে মারা গেছেন ১০২১ জন ব্যক্তি।) বলা বাহুল্য, বামফ্রন্ট সরকারের মতো একটি প্রগতিশীল সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পক্ষে এই তথ্য ছিল খুবই অনুপযুক্ত।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা দিয়ে শুরু হয় ১৯৯৪ সাল। এই বছরের ২ জানুয়ারি স্থানীয় সি পি আই (এম) বিধায়কের নেতৃত্বে একদল বিক্ষোভকারী নৈহাটির নিকটস্থ গরিফা পুলিস ফাঁড়িতে তাণ্ডব চালায় এবং এতে জখম হন ৮ জন পুলিসকর্মী। ২৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রথম নেতাজি জন্মোৎসবের সভায় যোগ দেন ময়দানে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে এবং এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেন যে অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নেতাজি সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। সন্দেহ নেই, এই স্বীকৃতি ছিল সি পি আই (এম)-এর মতাদর্শগত অবস্থানে এক বড় পরিবর্তন। একই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় সি পি আই (এম)-এর শিল্পনীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। জানুয়ারি মাসেই সি পি আই(এম) নেতৃবর্গের ভাষণে ও বিবৃতিতে স্পষ্ট হতে থাকে যে বেসরকারিকরণ সম্পর্কে সি পি আই(এম)-এর সুর নরম হচ্ছে।

অতঃপর ২৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির মূল বক্তব্য ছিল এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতঃপর এ রাজ্যে বিদেশী প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ কে স্বাগত জানাবে এবং বহুজাতিক সংস্থাকে বরণ করে নিতে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই যে উদার অর্থনীতির প্রবর্তন করেছে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারও এখন কার্যত সেই পথের পথিক এবং যে সি পি আই (এম) অতীতে বহুজাতিক সংস্থাকে নয়া-উপনিবেশবাদের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছে মতাদর্শগত আপস মেনে নিয়ে আজ তাকেই সে আবাহন করতে উদগ্রীব। তবে এ ছাড়া বোধহয় বামফ্রন্ট তথা সি পি আই (এম)-এর সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। কারণ রুগ্ন শিল্পে ও বেকারের সংখ্যায় এখনও পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের শীর্ষে এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে রাজ্যের শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.৮ শতাংশ

১৯৯৪ সালের ২৫ মে ২ টি কর্পোরেশন (শিলিগুড়ি ও আসানসোল) এবং ১৭টি পুরসভার (যার মধ্যে ১০টি ছিল নবগঠিত পুরসভা) নির্বাচন হয় (নির্বাচনের প্রাক্কালে শিলিগুড়িতে কংগ্রেস প্রার্থী খুন হন এবং নির্বাচনের দিন বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যাপক রিগিং, বুথ জ্যাম, ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং লাঠি ও গুলি চালিয়ে হাঙ্গামা ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এতৎসত্ত্বেও বামফ্রন্টের সাফল্য হয় সীমিত। ১৭টি পুরসভার মধ্যে বামফ্রন্ট ৮ টি, কংগ্রেস ২ টি এবং গোর্খাফ্রন্ট ৩ টিতে জয়ী হয়। বাকি ৪ টি পুরসভায় ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয়।

অবশ্য বামফ্রন্ট (শিলিগুড়ি ও আসানসোল) এই উভয় কর্পোরেশনই দখল করে। জুন মাসে কর্মচারীদের মাইনে দেওয়ার জন্য সরকার রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ নেয় এবং সরকার পুনর্নিয়োগ বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করে। এক বছর মন্ত্রিসভার বাইরে থাকার পর ১ আগস্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আবার মন্ত্রী হন ও শপথ গ্রহণ করেন। এই মাসেই কলকাতা পুলিসের এক সম্মেলনে বিদগ্ধ নগরপাল তুষার তালুকদার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক উজ্জ্বল মনীষী বলে বর্ণনা করেন। অক্টোবরে গাইঘাটা পঞ্চায়েতের ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্যা তপতী সরকারকে সি পি আই(এম) সমর্থকরা বিবস্ত্র করে পেটান। এই বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই এবং ধিক্কার জানায় বি জে পি। একই মাসে নৈহাটি পুরসভার বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে তাঁদের আলোচ্যসূচি বাতিল করতে বাধ্য করা হয় এবং নিগৃহীত হন ভাইসচেয়ারম্যান হীরেন সরকার।

এই নিগ্রহের ঘটনা দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় ১৯৯৫ সাল। ২ জানুয়ারি কলকাতার গার্ডেনরিচে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন সি পি আই(এম) সমর্থকরা তাঁর ওপর গুলি চালায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হলেও তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বারে বারে এইভাবে হামলা হওয়ায় সাধারণ মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং পরিণামে তাঁর জন প্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। ৪ জানুয়ারি কলকাতায় শুরু হয় কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের তিনদিন ব্যাপী শতবর্ষপূর্তি উৎসব। এই সম্মেলন উপলক্ষে বামফ্রন্ট সরকার তার নতুন শিল্পনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ আহ্বানে সচেষ্ট হয়। তবে সি পি আই(এম)-এর সকলে যে এই শিল্পনীতিকে মেনে নিতে পারেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই মাসেই। জানুয়ারির শেষ দিকে অনুষ্ঠিত সিপিআই(এম)-এর কলকাতা জেলা সম্মেলনে রাজ্যের নতুন শিল্পনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

ইতিমধ্যে কলেজ অধ্যাপকদের পুনর্নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে এই নিষেধ আরোপিত হয়নি (এবং আজও এই দু'ধরনের ব্যবস্থা অব্যাহত)। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে একটি স্বতন্ত্র কনভেনশন ডেকে সি পি আই, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের অধ্যাপক-সদস্যরা সরকারের পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তবে সরকারকে এ ব্যাপারে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনওটাই তাঁদের ছিল না।

১৯৯৫ সালের ২৮ মে অনুষ্ঠিত হয় ৭৫টি পুরসভার নির্বাচন এবং তার একমাসের মধ্যে নির্বাচন হয় আরও ৪টি পুরসভায়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস অবতীর্ণ হয় চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সোমেন গোষ্ঠী ও মমতা-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের নির্বাচনী

প্রচার থেকে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়ান এবং তাঁর নাম নিয়ে এক হাজার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। (অতঃপর নির্বাচনের দিন বহু জায়গায় সন্ত্রাস, বুথদখল, বোমাবাজি, গুলিচালনার ঘটনা ঘটে)এতৎসত্ত্বেও নির্বাচনে কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বামফ্রন্টের কাছ থেকে তিরিশটিরও বেশি পুরসভা ছিনিয়ে নিয়ে কংগ্রেস ৪৬টি পুরসভা দখল করে। শহরাঞ্চলে বামফ্রন্ট, বিশেষত সি পি আই (এম), যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে এই নির্বাচনী ফলাফলই ছিল তার প্রমাণ।

৮ জুলাই বিধাননগরের নবগঠিত পুরসভার এবং ৯ জুলাই কলকাতা পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিধাননগরে নির্বাচন হয় সম্পূর্ণ অবাধে ও শান্তিপূর্ণভাবে যে কারণে সেখানে কোন পক্ষেরই কোনও অভিযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের দিন বিভিন্ন জায়গায় বোমা ও গুলি চলে এবং বুথ জ্যাম করা হয়। এছাড়া গোছা গোছা ভোটপত্র ভোটবাক্সে ঢোকানো হয় জোর করে। এই নির্বাচন পরিচালনার কাজে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই নির্বাচনের পর ব্যক্তিগত স্তরে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সি পি আই(এম) ও সরকার অবশ্য এ সব কিছুকেই অপপ্রচার বলে দাবি করেছিল। লক্ষণীয় যে বিধাননগর পুর নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেননি। প্রশ্ন উঠেছিল কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে। এ থেকেই বোঝা যাবে, কোনটা ছিল সত্য প্রচার আর কোনটা ছিল মিথ্যা প্রচার। যাই হোক, ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে বিধাননগর পুরসভার ২২টি আসনের মধ্যে (১টিতে নির্বাচন স্থগিত ছিল) সি পি আই(এম) ১৩ টি ও কংগ্রেস ৯টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে অনেকের সংশয় থাকা সত্ত্বেও কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে মোট ১৪১টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট ৭০ টি, কংগ্রেস ৬৬ টি, নির্দল ৩ টি, এবং বি জে পি ২ টি আসন পায়। ১৯৯০ এর কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেসের ৬৬টি আসন পাওয়া ছিল এক বড় মাপের সাফল্যের সূচক। কারণ ১৯৯০-এর নির্বাচনে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৯৯ টি আসন, সি পি আই (এম) একাই পেয়েছিল ৭১ টি আসন এবং কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৩৭ টি আসন। কাজেই কলকাতাবাসী যে সি পি আই(এম) তথা বামফ্রন্ট সম্পর্কে খুবই বীতশ্রদ্ধ ১৯৯৫-এর কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের ফলাফলে তারই সঙ্কেত পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই চোদ্দ বছরে সি পি আই (এম)-এর সদস্য সংখ্যা বেড়েছে ১,৩৩,৯৯০। তবে (পার্টি জড়িয়ে পড়েছে নানা দুর্নীতি ও বিতর্কে। ওয়াকফ সম্পত্তি জলের দরে প্রমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অভিযোগ উঠেছে ওয়াকফ বোর্ডের কেষ্টবিষ্টুদের বিরুদ্ধে যাঁরা সকলেই ছিলেন পার্টির বড় নেতা। অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে যে বহু পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে আর্থিক নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে চরম স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। ১৯৯৫ সালের ২৯ অক্টোবর

ভবানীপুর থানার লক-আপে বিচারাধীন বন্দী সুভাষ দাসের মৃত্যু হয়। ১৯৯৫ সালে এটি ছিল পুলিস লক-আপে বিচারাধীন বন্দীমৃত্যুর পঞ্চম ঘটনা। এই ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চৌরঙ্গিতে ২১ দিন ধরে ধরনা দেন।

পাশাপাশি সি পি আই(এম)-এর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়ছে এবং ওয়াকফ কেলেঙ্কারি ও অন্যান্য দুর্নীতি নিয়ে পার্টির মধ্যে বিতর্ক তীব্র হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান সি পি আই(এম) নেতা ও প্রবীণ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী সর্বসমক্ষে বোমা ফাটান।১৭ ডিসেম্বর বর্ধমান টাউন হলে জলসম্পদ সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্রে তিনি বলেন : ‘‘এখন আমরা সবাই করাপটেড হয়ে গেছি’’। তিনি আরও বলেন যে সরকার হচ্ছে "অব দি কন্ট্রাক্টর, বাই দি কন্ট্রাক্টর, ফর দি কন্ট্রাক্টর"। মাত্র সাতদিন পরে কলকাতায় "লেক্সপো-২০" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি আবার বলেন :"দালালে ভরে গেছে চতুর্দিক, তারাই সব লুটেপুটে খাচ্ছে"।

অতঃপর নির্বাচনের বাজনা বাজলে দেখা যায় যে এই সৎ ও স্পষ্টবক্তা মানুষটি নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে আরও নয়জন সি পি আই(এম) বিধায়ককে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। অন্যদিকে কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল ভয়াবহ হয়ে ওঠে, মমতা-শিবির ও সোমেন-শিবিরের মধ্যে দড়ি টানাটানিতে রাজ্য কংগ্রেসের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠে৷ ১৯৯৬ এর ৮ এপ্রিল খবর প্রকাশিত হয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়তে রাজি নন এবং এই চরম অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই কংগ্রেস মুখোমুখি হয় নির্বাচনের। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৯৬ সালের ২ মে ও ৭ মে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কঠোর শাসনে সব পক্ষই প্রচারাভিযানে অতিমাত্রায় সতর্ক ও সংযত থাকে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে ছন্নছাড়া অবস্থাতেও কংগ্রেস বামফ্রন্টকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। উনিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে খারাপ ফল করে বামফ্রন্ট ও সি পি আই (এম) এবং সবচেয়ে ভাল ফল করে কংগ্রেস।

এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২০৩ টি, সি পি আই (এম) ১৫০ টি এবং কংগ্রেস পায় ৮২ টি (পরে একজন নির্দল যোগ দেওয়ায় তার মোট আসনসংখ্যা হয় ৮৩) আসন। মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত অঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে ও কলকাতা মহানগরীতে সি পি আই (এম)-এর সমর্থনে ফাটল ধরে। একই অবস্থা দেখা যায় সি পি আই(এম)-এর দুর্গ বলে পরিচিত বর্ধমান ও হুগলি জেলায় এবং যাদবপুরে। ১৯৯১-এর নির্বাচনে যে বর্ধমান জেলায় কংগ্রেস শূন্যফল করেছিল ১৯৯৬-এর নির্বাচনে সেখানে এই দল তিনটি আসন ছিনিয়ে নেয় এবং হুগলি জেলায় ছিনিয়ে নেয় পাঁচটি আসন। এ ছাড়া যাদবপুর, শ্রীরামপুর ও হাওড়ার লাোকসভা নির্বাচনে

কংগ্রেসের জয়ও ছিল বামফ্রন্ট তথা সি পি আই(এম)-এর এক বড় মাপের ব্যর্থতার সূচক। এই নির্বাচনে সি পি আই(এম)-এর গ্রামীণ ভাোটেও কমে যায়। কলকাতা মহানগরীর ২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস মোট ভোট পায় ১১,২১,৮০৫ আর বামফ্রন্ট পায় ৯,৯৫,৯৮১। অথাৎ কলকাতায় কংগ্রেস বামফ্রন্টের তুলনায় প্রায় দেড়লক্ষ ভোট বেশি পায়। কলকাতায় বিদ্যাসাগর, মানিকতলা, কবিতীর্থ, টালিগঞ্জ, কাশীপুর, এন্টালি প্রভৃতি বিধানসভা আসন বামফ্রন্টের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় কংগ্রেস।

পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের নিদ্রাভঙ্গ

১৯৯৬-এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চমবার ক্ষমতাসীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিশ্বরেকর্ড করে। তবে তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট খারাপ ফল করার জন্য সি পি আই (এম)-এর ভিতরে কারুর কারুর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ ওঠে। অতঃপর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব আর তর্কবিতর্ক চলতেই থাকে। যার পরিণামে দলের বেশ কিছু প্রভাবশালী সদস্যের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে কিছুসংখ্যক সদস্যকে (এমনকি নেপালদেব ভট্টাচার্যের মতো রাজ্য কমিটির সদস্যকেও) বহিষ্কার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এবারের মন্ত্রিসভায় ছিলেন না বিগত মন্ত্রিসভার বিনয় চৌধুরী, প্রশান্ত শূর, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ সি পি আই(এম) নেতৃবর্গ। বিধানসভাতেও এবার দেখা যায় অনেক নতুন মুখ। ইতিমধ্যে ৫ জুলাই বাংলা বন্ধের ডাক দেয় কংগ্রেস, আগস্টে উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় পুলিসের গুলিতে নিহত হয় দুজন ছাত্র এবং সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত মানবাধিকার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে ১৯৯৫ সালে পুলিস লক আপে ১৭ জন বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে।

পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকার কাজকর্ম শুরু করে একটু অন্যভাবে। রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের এতদিন যে গয়ংগচ্ছ ভাব চলছিল তাতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। অর্থাৎ যে সব উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল ঊনিশ বছর আগে সে সব বিষয়ে এখন আগ্রহ দেখাতে থাকে রাজ্য সরকার। যেমন, রাজ্যের দ্রুত শিল্পায়নের ব্যাপারে সরকারের তৎপরতা এখন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ঊনিশ বছর ধরে কলকাতায় প্রায় সব ফুটপাথ হকারদের দখলে চলে যাওয়ায় পথচারীদের অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করতে হয়েছে, যান চলাচলে নিদারুণ ব্যাঘাত ঘটেছে আর সময়ের অকারণ অপচয় হয়েছে এবং এসব কিছুর চূড়ান্ত পরিণামে ব্যাহত হয়েছে উৎপাদনশীলতা। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং সি পি আই (এম)-এর শাখা সংগঠন হকারদের ফুটপাথ দখলে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়েছে। অবশেষে ১৯৯৬ সালে পঞ্চমবার ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট তথা সি পি আই (এম)-এর ঘুম ভাঙে। ২৪ নভেম্বর রাত্রে অতর্কিতে হাতিবাগান, বেহালা ও ব্র্যাবোর্ন রোড অঞ্চলে হকারদের ফুটপাথে নির্মিত সমস্ত দোকানঘর ভেঙে দিয়ে শুরু হয় কলকাতা পুরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে অপারেশন সানসাইন নামে অভিহিত হকার উচ্ছেদ অভিযান যা ক্রমশ বিস্তৃত হয় কলকাতা শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও। কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কলকাতাবাসীই এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরোধিতা করেননি বরং একে স্বাগতই

জানিয়েছিলেন। তবে যে পদ্ধতিতে (অর্থাৎ, হকারদের পুনবার্সনের কোনও অগ্রিম ব্যবস্থা না করে তাঁদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা নেওয়া) এই অভিযান চালানো হয়েছিল তা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। এমনকি সি পি আই(এম)-এর শাখা সংগঠন 'সিটু'-ও এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ সাল শুরু হয় রাজ্যবাসীকে এই খবর জানিয়ে যে শুধু ভাড়াটে নয়, বাড়িওয়ালার স্বার্থ রক্ষার জন্য বিধানসভায় নতুন বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। নতুন বছরে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত কলকাতা নগরীতে ডাকাতি ও রাহাজানি খুবই বেড়ে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিস এইসব দুষ্কর্মের কিনারা করতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতীদের দাপট ও দুঃসাহস কতটা বেড়ে গেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন রাত্রে ভদ্রেশ্বর থানার ও ভোলানাথ ভাদুড়ি সমাজবিরোধীদের হাতে খুন হন। ১০ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮৩ টি ট্রেন ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এবং এই সংখ্যার বিচারে ট্রেন ডাকাতিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের সব রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই মার্চ মাসেই মাধ্যমিকের অঙ্ক ও ভূগোল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্য গাফিলতির গুরুতর অভিযোগও ওঠে। সরকার যথারীতি এই অভিযোগ উপেক্ষা করে যদিও শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার পালিস গ্রামে অনুষ্ঠিত জলসায় হাঙ্গামা থামাতে পুলিস গুলি চালায় এবং একজন নিহত হন। একই জেলার খেজুরহাটি গ্রামে চল্লিশটি পরিবার সি পি আই(এম) ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলে সি পি আই (এম) কর্মী আর সমর্থকেরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। এই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৫ জুন ফরওয়ার্ড ব্লক খেজুরহাটিতে সভা করে এবং দলের রাজ্য সম্পাদক এই সভায় সিপি আই(এম)-এর হামলাবাজদের ধিক্কার জানিয়ে বলেন যে, ‘‘সি পি এম নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিস লেলিয়ে গরিব মানুষের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে তেমনটি কংগ্রেস আমলেও হয়নি’’। জুন মাসে পি এল অ্যাকাউন্টের অপব্যবহার ও তজ্জনিত আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। এই ইস্যুতে অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ ও সি বি আই তদন্তের দাবিতে ৪ জুলাই বাংলা বধ ডাকে রাজ্য কংগ্রেস। অবশ্য রাজ্য কংগ্রেস এখন সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত। মে মাসে প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন সোমেন মিত্র। এরপর থেকে কার্যত সোমেন মিত্র ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুটি সমান্তরাল কংগ্রেস চলতে থাকে পশ্চিমবঙ্গে এবং এই গোষ্ঠীবিরোধ নগ্ন হয়ে দেখা দেয় যখন আগস্ট

মাসে কলকাতায় তিনদিনব্যাপী কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশন চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশন বয়কট করে কলকাতায় পাল্টাসমাবেশ করেন। ইতিমধ্যে ৬ জুলাই হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় রথ উৎসবে রথ টানাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ দেখা দিলে পুলিস গুলি চালায় এবং একজন নিহত হন। ৯৭ জুলাই মাস থেকে বর্তমান পত্রিকা তার বিক্রয়মূল্য কমিয়ে দিলে ১১ জুলাই 'সিটু' নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন পাঁচটি বিতরণ কেন্দ্রে এই পত্রিকা ছিনিয়ে নেয় এবং অতঃপর শুরু হয় সংবাদপত্রের দাম কমানোর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী আন্দোলন যা জনসমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হয়)। এক মাস পরে ১৯৯৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের জীবনে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। এই উপলক্ষে সরকার ও রাজ্য সি পি আই(এম) নেতৃবর্গ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সম্পর্কে দুটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক তথ্য সর্বত্র প্রচার করতে থাকেন। এই তথ্য দুটি হল এই যে পঞ্চাশ বছর পরে বামফ্রন্ট জমানায় রাজ্যের শিল্পবিকাশের হার হয়েছে প্রায় ১১ শতাংশ এবং কৃষি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে প্রথম স্থান দখল করেছে। বলা বাহুল্য, এই তথ্যদ্বয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচক। তবে সরকারিভাবে পরিবেশিত এই দুটি তথ্যই তথ্যাভিজ্ঞ মহলে সবিশেষ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৯৩-৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.৮ শতাংশ এবং এই বছরেও রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতবর্ষের সব রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থানে। লক্ষণীয় যে শাসক পক্ষ এই তথ্যের সত্যতা অস্বীকার করেননি। অতঃপর ১৯৯৭-এর মধ্য ভাগে সরকার ও সি পি আই(এম) দাবি করে যে ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্যে শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়ায় ১০.৮ শতাংশে। অর্থাৎ, দুবছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদন বাড়ে ৮ শতাংশ হারে। শিল্পক্ষেত্রে একে প্রায় জোয়ার বলেই গণ্য করা যায়। মজার ব্যাপার এই যে সরকার পক্ষ এই গোলাপি ছবি পেশ করার মাত্র পাঁচ মাস আগে ১৯৯৭ সালের ২ মার্চ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর জল প্রকল্পের শিল্যান্যাস করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, ''শিল্পায়নের জন্য নানা চেষ্টা করেও এখনও পর্যন্ত পেরে উঠিনি। রাজ্যে কলকারখানাও বেশি করতে পারিনি''। মুখ্যমন্ত্রী সত্য কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত রাজনৈতিক প্রচারের তাগিদে এই সত্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সোনালি রঙ লাগানো হয়েছিল।

অবশ্য এ কথা সত্য যে ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৪০৬ টি শিল্পপ্রকল্প ৩১,৫২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের অনুমোদন পায়। তবে এর মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ প্রকল্প রচনার কাজ শেষ হয় ১৯৯৭ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত। কাজেই শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে তখনও মোড় ঘোরানোর

মতো অবস্থা আসেনি। অতএব ১০.৮ শতাংশ হারে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। তাছাড়া শিল্পে অগ্রগতি ঘটলে তার প্রতিফলন পড়ে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন, সংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা বাড়ে, বেকারের সংখ্যা কমে, মাথা পিছু বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে কুড়ি বছরের বামফ্রন্ট শাসনের পরেও এইসব ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার। ১৯৯৫-৯৬ সালের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে যদি জোয়ার আসত অথবা শিল্পায়নে যদি ন্যূনতম সাফল্যও অর্জিত হত তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই এই সংখ্যাটা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত। কিন্তু ১৯৯৬ সালে দেখা যায় যে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কমে হয়েছে ২৩ লক্ষ। অন্যদিকে দেখা যায় যে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে গড় হিসাবে প্রতি বছর কর্মসংস্থান হয়েছিল ২০, ২৯০ জনের। পক্ষান্তরে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই ঊনিশ বছরে গড় হিসাবে এ রাজ্যে চাকরি পেয়েছিল বছরে ১০,৭৭৯ জন। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার। চোদ্দ বছর পরে ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ২১ হাজারে। আবার ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে তখন পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ। উনিশ বছর পরে ১৯৯৬ সালে দেখা যায় যে সারা দেশে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ লক্ষ নথিভুক্ত বেকার, অর্থাৎ বেকার সমস্যার ব্যাপারে ১৯৯৬ সালেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে প্রথম স্থানের অধিকারী। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে থাকে যা কুড়ি বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অন্যতম সুফল এমন একটা দাবিও এ রাজ্যের শাসক পক্ষ করেন। একথা অনস্বীকার্য যে বামফ্রন্ট সরকার শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং ১৯৯১ সাল থেকে শঙ্কর সেনের মতো এক যোগ্য ব্যক্তির হাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য আসে। তবে মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে যে তখন চাহিদার তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে থাকে তার মূল কারণ ছিল এই যে এই রাজ্যে গড় হিসাবে মাথা পিছু বিদ্যুতের চাহিদা বা খরচ অনেক কম যা কোনও শিল্পোন্নত রাজ্যের লক্ষণ নয়। ১৯৯৬ সালে মাথা পিছু বিদ্যুৎ খরচ হয়েছিল পাঞ্জাবে ৯০০ ইউনিট, হরিয়ানায় ৬৫৪ ইউনিট, গুজরাতে ৬৩৪ ইউনিট, মহারাষ্ট্রে ৫৭০ ইউনিট, অথচ পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৯০ ইউনিট। এ থেকে বোঝা যায় যে এই সব রাজ্যের তুলনায় ১৯৯৬ সালেও শিল্পোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ কতটা পিছিয়ে ছিল।

কুড়ি বছরের বামফ্রন্ট শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবে কৃষি উৎপাদনের সর্বভারতীয় ছবিটিও একই রকম। মূলত সবুজ বিপ্লবের সুবাদে ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয় এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে ভারতবর্ষে মোট উৎপন্ন

খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ কোটি টন, ১৯৫০-৫১তে যা ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন। দেশের এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের এই অগ্রগতির পিছনে বিশেষ অবদান ছিল সবুজ বিপ্লবের। তবে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে যে ভূমি সংস্কার হয় কৃষির অগ্রগতিতে তার অবদানও কিছু কম নয়। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের কৃষিজমিতে স্বত্ব সুরক্ষিত হওয়ায় রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি বর্গাদারই অধিক ফসল ফলাতে আগ্রহী হয় এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করতেও তারা শিখে যায়। স্বভাবতই এর প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে কৃষি উৎপাদনে এবং এ জন্য বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত ফসল সংরক্ষণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করতে না পারলে অধিক ফসল ফলিয়েও মার খেতে হয় চাষীকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে নজর দেয় নি বামফ্রন্ট সরকার। ফলে বামফ্রন্ট শাসনের কুড়ি বছরে বারে বারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাটচাষী এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে আলু চাষীদেরও রেকর্ড পরিমাণ ফসল ফলিয়ে মার খেতে হয়। ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লক্ষ টন আলু উৎপন্ন হয়েছিল। রাজ্যের হিমঘরগুলির সর্বাধিক মোট ২৭ লক্ষ টন আলু রাখার ক্ষমতা ছিল। আবার আলু রাখার জন্য বন্ড পাওয়ার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক ছিল রাজনীতি। ফলে ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের অনেক আলুচাষীই ফড়িয়া ও মজুদদারের কাছে জলের দরে আলু বিক্রি করে দিয়ে সর্বস্বান্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বামফ্রন্ট শাসনের কুড়ি বছর পূর্ণ হলে সি পি আই (এম) নেতৃবর্গ দাবি করতে থাকেন যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে শুধু বড় রকমের অগ্রগতিই হয়নি, এই সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের শীর্ষস্থানে এসে গেছে। অর্থাৎ, কৃষি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান পাঞ্জাবেরও ওপরে। কৃষিপণ্যের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের রাজ্য পাঞ্জাবের ওপরে চলে গেছে কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। কারণ মনে রাখতে হবে যে পাঞ্জাবে মোট চাষের জমি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম। তথাপি দেখা যাচ্ছে যে পাঞ্জাবে কৃষিপণ্যের মোট উৎপাদন ১৯৮০-৮১তে ছিল ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২১ হাজার টন এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ৮৩.০১ শতাংশ বেড়ে তা হয় ২ কোটি ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার টন। পক্ষান্তরে এই উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০-৮১ সালে ছিল ৮২ লক্ষ ৮২ হাজার টন এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ৬০.৩৩ শতাংশ বেড়ে তা হয় ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৭৯ হাজার টন।

সন্দেহ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্য সম্পর্কেও। নব্বইয়ের দশকে জেলায় জেলায় ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযান চালানোর পর রাজ্য সরকার ১৯৯৬-৯৭ সালে দাবি করেন যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি জেলা পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করেছে এবং এ রাজ্যে এখন

সাক্ষরতার হার হল ৭০.৩৯ শতাংশ। এর অর্থ হল এই যে সর্বভারতীয় সাক্ষরতার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার অনেক বেশি। এই তথ্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, সন্দেহ নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম সম্পর্কে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন যে গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্গের বহু মানুষ এখনও নিরক্ষরই রয়ে গেছেন। তাঁরা এখনও নিজের নাম সই করতে পারেননা। এর অর্থ এই নয় যে তার কুড়ি বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করেনি। অনেক কিছুই এই সরকার করেছে অথবা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভূমিসংস্কার ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রেই তার কাজের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ছিল না অথবা পরিপ্রেক্ষিত থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে রাজনীতি। এর ফলে কোনটা কাজ আর কোনটা অকাজ অথবা কোন কাজটা আগে দরকার এবং কোনটা পরে সে বিষয়ে কোনও সুচিন্তিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়নি সরকারের গৃহীত কর্মসূচিতে; সব কাজকর্মই চলেছে অ্যাডহক ভিত্তিতে। অন্যদিকে সরকারি কাজকর্মে গতি সঞ্চারের কোনও চেষ্টা করেনি বামফ্রন্ট সরকার। আমলাতন্ত্র আর লাল ফিতার কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ প্রশাসন পদে পদে হোঁচট খেয়েছে। এছাড়া কুড়ি বছরের বামফ্রন্ট শাসনে ওয়ার্ক কালচার কার্যত অস্তমিত হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী সরকারি কর্মচারী সংগঠনটি সি পি আই(এম)-এর রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক হওয়ায় সরকারি কর্মচারীদের আলস্য ও ফাঁকিবাজি সরকারকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। পরিণামে সব সরকারি অফিস থেকেই বিদায় নিয়েছে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি আই(এম) যে মতাদর্শে বিশ্বাসী তা সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত সমাজকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে। অথচ যে উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সে অংশগ্রহণ করে চলেছে তা বিশ্বাসী মুক্ত সমাজে অর্থাৎ সার্বভৌম রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের স্বাতন্ত্র্যকে সে স্বীকার করে নেয়। সি পি আই (এম) -এর স্ববিরোধিতা হল এই যে মতাদর্শগত অবস্থানে আপস করে সে উদারনীতিবাদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সোৎসাহে বরণ করে নিয়েছে এবং কুড়ি বছর ধরে একটানা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকার ফলে তার বিপ্লবী রাজনৈতিক সত্তা বুর্জোয়া অভ্যাসে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তার মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র সমাজকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর হয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে দেখা যায় যে সমগ্র বাঙালি সমাজ তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে নতমুখে কম্পমান। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙালি সমাজ জীবনে আজ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তবে এ জন্য দলনিরপেক্ষ বাঙালিও কম দায়ী নয়। এ কথা বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে বিগত পঞ্চাশ বছরের বাঙালি সমাজজীবনের বৃহত্তর চালচিত্রে।

বাঙালি জীবনে দুর্যোগ

স্বাধীনতা-পূর্বকালে বাঙালি জীবন ছিল খুবই নিস্তরঙ্গ ও ছক বাঁধা এবং তার গতিপথ ছিল নিতান্তই সরল। শহরাঞ্চলে ছিলেন চাকুরীজীবী আর বিভিন্ন পেশাজীবী। উপার্জন নিয়ে, পরিবারের স্বার্থ নিয়ে এবং নিজ নিজ কর্মজীবন নিয়ে চিন্তা তাঁদের অবশ্যই ছিল। কিন্তু এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে তাঁরা অস্থির হতেন না। অর্থাৎ, তাঁদের ব্যস্ততা ছিল, কিন্তু তাঁরা উদ্ব্যস্ত হতেন না। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের বাঙালি জীবন ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। স্বভাবতই এই জীবন চলত ধীর গতিতে এবং তাতে বহির্মুখিতা ছিল না। গ্রামের বাঙালির কাউকে কাউকে হয়তো নিতান্ত নিরুপায় হয়ে শহুরে জীবন মেনে নিতে হত। তবে গ্রামজীবনের শিকড় তাঁরা উপড়ে ফেলতেন না এবং গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরে চলে যাওয়ার প্রবণতাও তখন ছিল না। আবার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে গ্রামজীবনে নগরসংস্কৃতির অনুপ্রবেশও তখন ঘটেনি। গ্রাম ও শহর ছিল তখন দুই ভিন্ন জগৎ যদিচ এই দুই জগতেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার জোয়ার-ভাঁটা কখনই বিপদসীমা অতিক্রম করত না এবং এই দুই জগতেই সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আড়ম্বর ছিল কম। কিন্তু অভাব অনুভূত হত না হৃদয়ের উষ্ণতার। অতঃপর শহর জীবনে সর্বনাশের ঝড় নিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বঙ্গবিভাগ। অন্যদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিণামে দুঃখ-ক্লেশে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় গ্রামের বাঙালিজীবন। এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা যখন আসে তখন সমাজ ভরে উঠেছে অসাধুতা, অনৈতিকতা আর অমানবিকতার কলুষে এবং এরই মাঝখানে দণ্ডায়মান বাঙালি সম্পূর্ণ বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত। তবে সুখের কথা এই যে বাঙালি জীবনের এই দুযোগপৰ দীর্ঘমেয়াদী হয়নি, সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠে বাঙালি তার দুর্দিনের মোকাবিলা করতে পেরেছিল সাফল্যের সঙ্গে এবং তার শ্লথগতি জীবনধারায় এসেছিল প্রাণচাঞ্চল্য আর গতিশীলতা। এ জিনিস সম্ভব হয়েছিল মূলত তিনটি কারণে। প্রথমত, দুঃসময়ের মধ্যেও বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও সৃজনশীল শিল্পী সম্প্রদায় তাঁদের শুভবুদ্ধি, সাহস, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা হারাননি। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলেন। নিছক অর্থোপার্জন তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল না, সঙ্কীর্ণতা তাঁদের আচ্ছন্ন করেনি এবং মহত্তর আদর্শের প্রতি ছিল তাঁদের অঙ্গীকার । স্বভাবতই তাঁদের জীবনচর্যা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে, তাঁদের আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে

এবং তাঁদের সৃষ্টির স্বাদ পেয়ে পতনোদ্যত বাঙালি অনুপ্রাণিত বোধ করেছিল এবং পরিণামে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর যে আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কার্যকর হয় তা চাক্ষুষ করে এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে শিক্ষিত বাঙালি আধুনিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং বাঙালিজীবনে ধীরে ধীরে আধুনিকতা পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কর্ণধার হিসাবে বিধানচন্দ্র রায় বাঙালিজীবনে যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন তার সদর্থকতায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি আপনা-আপনিই মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে। আরও উল্লেখ্য যে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী উন্নয়নের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন তাতে স্বাধীনতা-পূর্বকালের তুলনায় বাঙালি সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থাকে অগ্রণী স্থানে, শহরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিস্তৃত হয় গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত, অনেক নতুন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার ফলে শিক্ষার সুযোগ বাড়ে এবং যোগ্য স্থানে যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ায় কাজের গতি বাড়ে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে বিধানচন্দ্র বিপুল ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও উদারনীতিবাদের মূল আদর্শ মেনে চলার চেষ্টা করেছিলেন, অর্থাৎ, তাঁর আমলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল এই অর্থে যে সমাজের সর্বত্র তিনি রাজনীতির অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেননি। এসব কিছু দেখে বাঙালি ফিরে পেয়েছিল তার আশা-ভরসা এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে নিরাপত্তাহীনতায় সে আক্রান্ত হয়েছিল তার অনেকটাই সে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। তৃতীয়ত, বঙ্গবিভাগের পরিণামে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সর্বস্ব হারিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন তাঁদের কঠোর জীবন-সংগ্রামও প্রভাবিত করে বাঙালি জীবনকে। গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে আগত বাঙালিদের সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা মনে করতেন যে উদ্বাস্তু আগমন তাঁদের জীবনে অকারণ দুর্ভোগ নিয়ে এসেছে। ফলত স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রথম পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সমাজ কার্যত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালির মধ্যে এই ব্যবধান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্বাধীনতার পনেরো বছরের মধ্যেই দুই শ্রেণীর বাঙালির মধ্যে সমন্বয় ঘটে এবং পরবর্তীকালে 'ঘটি বাঙালের লড়াই' শুধু ফুটবল খেলার মাঠেই নিবদ্ধ থাকে, অন্যত্র নয়। দুই বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মিলনসেতু রচিত হয়েছিল এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে। পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের সামনে ছিল নতুন করে জীবন শুরু করার এক কঠিন ব্রত। বলা বাহুল্য, ভয় না পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের এই অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং পনেরো বছরের মধ্যেই এই পরীক্ষায় তাঁরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাঁদের এই ঐতিহাসিক সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে শুধু বিস্মিতই করেনি, এই সফল যোদ্ধাদের সম্পর্কে তাঁদের মনে মনে শ্রদ্ধাশীলও করে তোলে এবং এ থেকেই জন্ম নেয় এক সম্প্রীতির বাতাবরণ যা

দুই বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ্ ও তিক্ততার অবসান ঘটায়। এছাড়া সংগ্রামলিপ্ত শরণার্থী বাঙালি যে গতিশীলতার পরিচয় দেয় তা অনিবার্যভাবেই সঞ্চারিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এবং এইভাবে স্বাধীনতার পনেরো বছরের মধ্যেই বাঙালি জীবন গতিশীল হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে সমাজোন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা ধরনের পেশার উদ্ভব হয়েছে, বেড়েছে চাকুরিজীবীর সংখ্যা এবং পরিণামে বাঙালি জীবনের গতিশীলতা বেড়েছে। অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও ট্রানজিসটার রেডিও সেটের ব্যাপক প্রচলনের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে দূরত্ব কমছে এবং নগর সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে গ্রামাঞ্চলে। পরিণামে অনড় গ্রামজীবনে দেখা দিচ্ছে সচলতা এবং গ্রামীণ বাঙালি বহির্মুখী হতে শুরু করেছে। এসব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে দ্রুত আধুনিক হয়ে উঠছে বাঙালি জীবন এবং স্বাধীনতা-পূর্বকালের গতিহীন সাবেকি জীবনের সঙ্গে ষাটের দশকের গোড়ার দিকের বাঙালি জীবনের বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নেই। এসবই ছিল বাঞ্ছিত সমাজপ্রগতির লক্ষণ। তবে বাঙালি জীবনে আধুনিকতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তার কুফলও ছড়িয়ে পড়তে থাকে বাঙালি সমাজে। যেমন, সমাজজীবনে আধুনিকতা যত প্রসারিত হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে চাকুরিজীবীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে ততই বাঙালি যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরতে থাকে। এই ভাঙনের পথ ধরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ শেষ পর্যন্ত এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছায় যেখানে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের সন্তানাদি নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একক পরিবারই হয়ে ওঠে বাঙালি সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছেলেমেয়েরা সংসারের আরও পাঁচজনকে ভালবাসার ও তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা অনিবার্যভাবেই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং এইভাবেই বাঙালি জীবনে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে ওঠে স্বার্থসর্বস্বতা। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো যখন দুষ্কর হয়ে পড়ে তখন নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত বাঙালি সমস্ত নীতিবোধ আর মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে পরিণত হয় আত্মস্বার্থের ক্রীতদাসে (এর ফলাফল কী হয় তা আলোচিত হবে একটু পরে)। এছাড়া আধুনিকতা আয়ত্ত করতে গিয়ে মননের আধুনিকতার চেয়ে বাঙালি বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে বহিরঙ্গের আধুনিকতার ওপর। এর ফলে পুরানো দিনের ধ্যান-ধারণা ও অন্ধ সংস্কার থেকে তার মুক্তি না ঘটলেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে তার চালচলনে ও পোশাক-পরিচ্ছদে এবং বাঙালি সমাজে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে ইংরাজিয়ানার। তাই দেখা যায় যে স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে সাবেকি বাঙালি পোশাক কার্যত বিদায় নিয়েছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে ও সাহেবি কেতা শেখাতে খুবই তৎপর এবং নিজেদের ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে বাঙালি ক্রমশই তার উৎসাহ ও আগ্রহ হারাচ্ছে।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই এক দশক সময় বাঙালি জীবনে এক চরম বিভ্রান্তির পর্ব হিসাবে দেখা দেয়। এই কালপর্বে বাঙালি সমাজ উত্তাল হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জটিলতায়, হত্যার রাজনীতি মনুষ্যত্ব ও মানবজীবনের মূল্য কমিয়ে দেয় আর সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলায় বেপরোয়া আঘাত হানতে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায় এবং রাজনীতির জগৎ থেকে ক্রমশই বিদায় নিতে থাকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, যৌক্তিকতা আর নীতিবোধ। এর ফলে বাঙালি জীবনে দেখা দিতে থাকে বিপন্নতা এবং যত এই বিপন্নতা বাড়তে থাকে ততই গড় বাঙালি তার নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলত স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরে দেখা যায় যে বাইরে ভণ্ডামি বজায় রাখলেও বাঙালি তার অন্তর থেকে বিদায় দিয়েছে শুভবুদ্ধি আর সামাজিক দায়িত্ববোধ। পরার্থপরতা তার কাছে এক বিস্মৃত শব্দ, সে শুধু বোঝে তার নিজের স্বার্থ এবং এই স্বার্থপূরণের জন্য যে কোনও ধরনের আপস করতে সে সততই প্রস্তুত। বাঙালি জীবনের এ ছিল এক বড় সঙ্কট। অবশ্য অতীতেও বাঙালি জীবনে সঙ্কট দেখা দিয়েছে বারে বারে। তবে সেই সব সঙ্কটের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল মূলত এই কারণে যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁদের শুভবুদ্ধি, সাহস ও সততা হারাননি। তাঁরা পথহারা বাঙালি সমাজকে সতর্ক করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, পথের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদ করেছেন উচ্চকণ্ঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতার তিন দশক পরে যে স্বার্থপরতায় বাঙালি আচ্ছন্ন হয় তার কবল থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি, সাধারণ বাঙালির মতো তাঁরাও অগ্রাধিকার দিতে থাকেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে। ফলত, সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা ও সদিচ্ছা এই দুই-ই তাঁরা হারান। এইভাবেই সমগ্র বাঙালি সমাজে শুরু হয় মূল্যবোধের অর্ন্তর্জলি যাত্রা।

এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থার হাল ধরে। কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাসীন হতে দেখে অনেকেই সেদিন আশা করেছিলেন যে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন কংগ্রেসি অপশাসনের শিকড় উৎপাটিত করে শুধু শাসন ব্যবস্থাতেই সুপরিবর্তন আনবে না, একই সঙ্গে বাঙালি জীবনকেও গ্লানি ও কলুষমুক্ত করে তুলবে। বস্তুত, সে সময় সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্টের নেতৃপদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের এই পরিবর্তন আনার যোগ্যতা যে ছিল সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কোনও সংশয় ছিল না। সম্ভবত এই জন্যই ১৯৭৭ সালে যে বামফ্রন্ট জিতেছিল নেতিবাচক ভোটে ১৯৮২ সালে তাকে ইতিবাচক ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী পুনরায় জয়যুক্ত করে। কিন্তু (দশ বছর পরে দেখা যায় যে, যে আদর্শানুরাগ ও মূল্যবোধ বজায় রেখে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাধারণ নাগরিককে উজ্জীবিত করতে পারে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রে তার বড়ই অভাব রয়েছে। এই দশ বছরে সিপি আই(এম) তথা বামফ্রন্ট দলীয় স্বার্থকেই

তার কর্মসূচির নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্যবহার করে)এবং পরবর্তী দশ বছরেও এই ধারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই দলবাজিতে দলের লাভ হয়েছে বিস্তর, কিন্তু সমানুপাতিক হারে লাভ হয়নি পশ্চিমবঙ্গের। যেমন, ১৯৭৭ সালে সি পি আই (এম) এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩ হাজার, কুড়ি বছর পরে তা বেড়ে হয় ২ লক্ষ ২৩ হাজার এবং কুড়ি বছরে এই দল এতই বিত্তশালী হয়েছে যে তার সঙ্গে এখন সম্ভবত তুলনা করা চলে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও একটি প্রধান বুর্জোয়া দলের। অথচ বিগত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু এই হারে এগোতে পারেনি। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে দেখা যায় যে অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন লক্ষ বেকার এ রাজ্যে চোখের জল ফেলছে, সরকারি হাসপাতালগুলিতে চরম অব্যবস্থা যার সুযোগ নিয়ে রাজ্যে আজ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য প্রাইভেট হাসপাতাল আর নার্সিংহোম, শিক্ষার সব আর্থিক দায়িত্ব সরকার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার মান এতটা নিম্নমুখী যে বি এ, বি এস সি পাস করে মেধাবী ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই অন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায় এবং কুড়ি বছরের মধ্যে সরকারি অফিসগুলিতে ওয়ার্ক কালচার সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু নির্বাচনের পর নির্বাচন জিতে উপর্যুপরি পাঁচবার ক্ষমতাসীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিশ্বরেকর্ড করেছে এবং নির্বাচনে শুধু রিগিং করে যে এই অসামান্য সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়, শিক্ষিত বাঙালির সমর্থন যে এখনও বামফ্রন্টের অনুকূলেই রয়েছে এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। অথচ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় কিন্তু অন্তত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখে সততই শোনা যায় শাসক দল সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আর সমালোচনা। তবে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার মতো ইচ্ছা বা সাহস কোনওটাই তাঁদের নেই এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ নিশ্চুপ) আরও উল্লেখ্য যে ১৯৭৭ সালের পরবর্তী কুড়ি বছরে সি পি আই(এম)-এর সদস্য সংখ্যা যে প্রায় দুলক্ষ বেড়েছে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এসেছে মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায় থেকে।

প্রতিবাদ আর সমালোচনাই হল সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বাস্থ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বাঙালি যদি এ কথা মনে রাখতে পারত এবং ভীরুতা আর কাপুরুষতা ঝেড়ে ফেলে উলঙ্গ রাজার দিকে তর্জনী তুলে ধরতে পারত তাহলে শাসক দল তার কর্তব্য পালনে সবিশেষ তৎপর হত এবং সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটা আজ অন্যরকম হত। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীরা যদি সমাজের স্বাতন্ত্রের দাবিতে নিরন্তর সোচ্চার হতেন তাহলে কুড়ি বছরে বামফ্রন্ট শাসনে সমাজের সর্বত্র রাজনীতির হুকুমদারি বন্ধ হত এবং মুক্ত সমাজের সাযুজ্যে সজীব হয়ে উঠত বাঙালি জীবন। কিন্তু বাঙালি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে তার গৃধ্নুতা, তার স্বার্থসর্বস্বতা। সে বুঝেছে যে শাসক দলের ছাতার তলায় ভিড় জমালে, শাসক দলের কাছাকাছি থাকলে অথবা শাসকদলের বিচ্যুতি-ব্যর্থতার নগ্ন নৃত্য দেখেও অন্ধ-বধির হয়ে থাকলে অনেক উপঢৌকন ও স্বার্থের উপকরণ মেলে। যেমন, মোটা মাইনের উঁচু পদ পাওয়া যায়,

মনীষীদের নামাঙ্কিত পুরস্কার পাওয়া যায়, পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য চাকরি পাওয়া যায়, সরকারি জমি ও ফ্ল্যাট পাওয়া যায়, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা যায়, বড় রাজনৈতিক নেতার জীবনী রচনা করে রাতারাতি সুবিখ্যাত হওয়া যায়, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আবার নতুন চাকরি পাওয়া যায় এবং পাওয়া যায় আরও অনেক কিছু। এই প্রাপ্তির লোভে স্বার্থমগ্ন বাঙালি দলে দলে পার্টির খাতায় নাম লিখিয়ে অথবা পার্টি আনুগত্যের ভেক ধরে নিজ নিজ রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে রাজনীতির রাহু গ্রাস করেছে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনকে।

তবে শুধু রাজনীতি নয়, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে বাঙালি জীবনে আঘাত এসেছে অন্যদিক থেকেও। সত্তরের দশকের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত দূরদর্শনের সম্প্রচার। কুড়ি বছরের মধ্যে এ রাজ্যে শুধু দূরদর্শনের ব্যাপক প্রসারই ঘটেনি, অনুপ্রবেশ ঘটেছে বহু বেসরকারি চ্যানেলের এবং এই বেসরকারি চ্যানেলগুলির আকর্ষণ বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে। এইসব বেসরকারি চ্যানেলে সম্প্রচারিত সস্তা ও অশালীন বিনোদন বাঙালি সংস্কৃতিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অথচ তরুণ বাঙালি প্রজন্মের ওপর এদের প্রভাব অপরিসীম। এর ফলে নবীন প্রজন্ম আজ পশ্চিমবঙ্গে ভুলতে বসেছে বাঙালি জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, বাঙালিয়ানার মহিমা ও গৌরব। বলা বাহুল্য, এ এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বাঙালি সংস্কৃতিতে এই ভাঙনের স্রোত এখনই প্রতিহত করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে একদিন বাঙালি হবে এক আত্মবিস্মৃত জাতি এবং তাকে দগ্ধ করবে সত্তার সঙ্কট। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে এই সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গে কেউই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেননি--সরকার ব্যস্ত থেকেছে নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটাতে, রাজনীতিকরা চিৎকার আর আস্ফালন করেছেন, কিন্তু কাজের কাজ করেননি, বুদ্ধিজীবীরা থেকেছেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় আর সাধারণ বাঙালি নিজ স্বার্থের শস্য সংগ্রহে ব্যস্ত থেকেছে। ইতিহাস সম্ভবত একদিন এ কথা স্মরণ করে আজকের বাঙালি সমাজকে ধিক্কার জানাবে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

- Subversion of Parliamentary Democracy in West Bengal, Calcutta, 1972------ Jyoti Basu
- Politics of violence: A case study of West Bengal, Calcutta 1982------ Sajal Basu
- With West Bengal Chief : Memories 1962 to1977, New Delhi 1977.------ Saroj Chakroborty
- The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism, Calcutta,1998------- Partha Chatterjee
- Politics in West Bengal: Institutions, Processes and Problems, Calcutta, 1985----- Rakhahari Chatterjee (ed.)
- West Bengal in Myron Weiner (ed.) State Politics in India, New Jersey----- Marcus F Franda
- Political Development and political decay in Bengal, Calcutta 1971------Marcus F Franda
- ‘Personalities in the Fray ' The Illustrated weekly, May 2, 1982
- The Disinherited state: A study of West Bengal, Bombay,1971----Shankar Ghosh
- Bengal : The Communist Challenge , Bombay, 1985,---- CR Irani
- Dimensions of Political Communication in West Bengal : 1970s, Calcutta, 1985----- Srabani Rai Chaudhary
- Left Experiment in West Bengal, New Delhi, 1985----- Prafulla Rai Chaudhuri
- The Agony of West Bengal : A study in Union-State Relations, Calcutta, 1973------- Ranjit Rai
- Panchayati Raj and the Decentralization of Development Planning in West Bengal, Calcutta, 1992----- Neil Webster
- West Bengal Government’s Memorandum : Center-state Relations, Calcutta, 1979
- আনন্দবাজার পত্রিকা, The Stateman, বর্তমান
- পালাবদলের পালা, কলকাতা, ১৯৭১------ বরুণ সেনগুপ্ত